মধুচক্র

শক্তিপদ রাজগুরু

পূর্বাচল
৮২, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
সুধীন্দ্র চৌধুরী
৮২, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
অমলেন্দু কর্মকার

প্রথম প্রকাশ :
আগষ্ট ১৯৬৩

মুদ্রক :
শ্রীলক্ষ্মী প্রেস
শ্রীশক্তিপদ পাল
৩৬ ডি বেথুনরো
কলিকাতা-৬

আজব শহর কোলকাতা, বিচিত্র এক রহস্যময় জগৎ, লাখো মানুষ এখানে আসে বাঁচার তাগিদে। কেউ পায়ের নীচে মাটি পায়, কেউ হারিয়ে যায় এর অন্ধকার অতলে। কোলকাতা তাদের কোন খবরই রাখে না।

একটি অসহায় মেয়েও এমনি বাঁচার তাগিদে এসেছিল এই মহানগরে, তার অজানতেই সে জড়িয়ে গেল এর অন্ধকার জগতের মেকি চাকচিক্য আর জৌলুসে, এ যেন নূনের পুতুলের সমুদ্র দর্শন। সেই জীবনের দুঃখ বেদনাময় একটি রূপকেই নিপুণ কথাকার রূপায়িত করেছেন বাস্তব পটভূমিকায় সার্থক রূপে।

প্রকাশক

আজব শহর কলকাতা। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়—তাদের জীবিকাও বহু বিচিত্র ধরনের। আর জীবনযাত্রার মানও সেই রুজি রোজগারের উপরই নির্ভরশীল। কেউ থাকে ঝুপড়িতে পথের ধারে; কেউ বা কোনও মতে একটা আশ্রয় খুঁজে নিয়ে মাথা গুঁজে থাকে, যাতায়াত করে বাদুড়ঝোলা হয়ে ট্রামে বাসে, কেউ চরণ যুগলের উপরই নির্ভরশীল। কেউ গাড়ি হাঁকায়, থাকে অভিজাত এলাকার কোনও বাগানঘেরা বাড়িতে, কেউ বা মাথা গোঁজে কোন ফ্ল্যাটবাড়ির কোটরে।

বহু বিচিত্র মানুষ, বহু শ্রেণীর মানুষ—আর বহু বিচিত্র তাদের জীবন। সব নিয়ে কলকাতার জীবনপ্রবাহ গঙ্গার ধারার মতই একাল থেকে মহাকালের দিকে বয়ে চলেছে সেই জব চার্নকের আমল থেকেই। সর্বংসহা কলকাতা, এই মহানগরী। বহুজনকেই সে আশ্রয় দেয়, অন্ন দেয়। তাদের বহু পাপ-পুণ্যকে বুকে নিয়েই সে নির্বিকার। আপন চলার গতিতে সে গতিময়, প্রাণ উচ্ছল।

ইরা এই শহরটাকে তার অজানতেই ভালোবেসে ফেলেছিল। তন্বী, সুন্দরী। বয়স পঁচিশের কোঠাতে হলেও মনে হয় আরও কম। নরম মিষ্টি চেহারা। তাই ওর বাবা প্রথমে ওকে কলকাতার মত শহরে আসতে দিতে চায়নি।

বর্ধমান শহরের একপ্রান্তে ওদের ছোট্ট বাড়ি, মফঃস্বলে কিছু জমি জায়গা আছে। বাবা নরেশবাবু রিটায়ার করেছেন চাকরী থেকে। ইরা তখন বি-এ পাশ করেছে সবে। ওখানের কলেজের বান্ধবী নিভা, নিভার কোন মামা ওখানে চাকরী করতেন। নিভাদের আদি বাস কলকাতায়, ওদের অবস্থাও ভালো। নিভাও দেখতে বেশ ছিমছাম আর সহজ ধরনের মেয়েই। তাদের কলকাতায় রাসবিহারী এভিনিউ এলাকায় বিরাট বাড়ি। কিন্তু ওর বাবা মারা যাবার পর সৎমা ঠিক সতীন কাঁটা নিভাকে পছন্দ করতেন না বোধহয়, আর নিভাও শান্তিপ্রিয় মেয়ে। তাই কলকাতায় মায়ের ওখানে না থেকে মামার কাছে এসে এখানে থেকেই পড়তো বর্ধমান কলেজে।

নিভার মনের অতলেও ছিল নীরব একটা বেদনা, আর শূন্যতার জ্বালা। এখানে ক্লাশে সকলের সঙ্গে মিশে তেমন হৈ চৈও করতো না। অবশ্য ওর এই এড়ানো ভাবটাকে ক্লাশের অন্য মেয়েরা ভালো চোখে নেয়নি। তারা বলতো আড়ালে।

—কলকাত্তাইয়া মেয়ে কিনা, তাই মিশতে চায়না মফঃস্বলের মেয়েদের সঙ্গে। ওসব ফাট বুঝিরে।

কিন্তু ইরা নিভাকে দেখেছিল অন্যচোখে।

ওদের একই পাড়ায় বাড়ি, কলেজ যাতায়াতের পথে দেখা হতো, তারপর হ'ল পরিচয়। নিভারও ইরাকে ভালো লেগেছিল।

ক্রমশঃ ওদের বন্ধুত্ব গভীর হয়ে উঠেছিল। ছুটির দিন দুজনে বেড়াতে যেতো দামোদরের দিকে। বালিয়াড়িতে পা ডুবিয়ে হাঁটতো, দুজনে দুজনের মনের কথাও জেনেছিল তখন।

ইরা বলে—বাবা রিটায়ার করবেন, ভাইবোনেরাও ছোট। এবার চাকরীই খুঁজতে হবে। তুইতো পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা ফিরে যাবি।

নিভা শুনছে কথাগুলো। ওর মতই নিভার মনের অবস্থা। মামার সামান্য রোজগার। তার সংসারে বোঝা হয়ে থাকতে চায় না নিভা। কলকাতায় তার চেনাজানা—আত্মীয়-স্বজন আছে অনেক ভালো পোষ্টেই। ফিরে গিয়ে চাকরীই করবে সে। সৎমায়ের সংসারে গিয়ে থাকতে মন চায়না। নিভা বলে,

—দেখা যাক কি হয়? তুইও কলকাতা চল না ইরা!

ইরা চাইল। বলে সে—কলকাতায় গেলে একটা পথ হয়তো হবে, কিন্তু সেখানে আপনজন' তো কেউ নেই। অজানা শহর—

নিভা বলে—আমি তো থাকছি সেখানে।

সংকোচভরা স্বরে ইরা বলে।

—তোর বোঝা হয়ে থাকবো সেখানে?

নিভা বলে—তোর রূপগুণ যা আছে তাতে তুই ওখানে গেলে

কারোও বোঝা হবি না রে। কলকাতা বিচিত্র জায়গা—কোন না কোন কাজ মিলে যাবে। চলতো।

ইরা কি স্বপ্ন দেখছে।

দু'একবার কলকাতায় বেড়াতে গেছে। সকালের ট্রেনে গিয়ে সেখানে ঘুরেছে। চিড়িয়াখানা—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখেছে, দেখেছে চৌরঙ্গীর সেই আকাশছোঁয়া প্রাসাদগুলোকে—সাজানো ঝকঝকে দোকান পশার, প্রাচুর্য, সম্ভাবনা সেখানে উপছে পড়ছে। তাদের এই শহরের মত ম্লান, বিগতযৌবনা নয়, কলকাতা চিরযৌবনবতী কল্লোলিনী। সেখানের প্রাচুর্যের মাঝে গরীব ইরারও দিন বদলাবে। সেও অনেক কিছুই পাবে, পাবার স্বপ্ন দেখে। বলে নিভাকে।

—ঠিক আছে। তুই গিয়ে দেখ কিছু উপায় করতে পারলে জানাবি। চলে যাবো। এখানে এই এঁদো জায়গায় কিছু হবে নারে।

পরীক্ষা হয়ে গেছে ওদের।

ক'বছর ধরে নিভা আর ইরার পরিচয়। দুজনে প্রায় সমবয়সীই। আর মনের দিক থেকেও তাদের একটা মিল ছিল। তাই দুজনে দুজনের কাছাকাছি হয়েছিল। দুজনে ছিল খুবই কাছের মানুষ।

নিভা এবার কলকাতায় ফিরে যাচ্ছে।

কলকাতা থেকে মাও নিভাকে চিঠি লিখেছে। এতদিন মেয়েকে ছেড়েছিল। হোক সৎমা। তবুও এবার জেনেছে যে মেয়ে যোগ্য হলে তারই কাজে আসবে।

এখন তাই তাকে দরকার।

সুতরাং নিভাকে তাই কলকাতায় ফিরে যেতে লিখেছে মা।

চলে যাচ্ছে নিভা। নিভার মামীমা অবশ্য আপত্তি করেননি ওর চলে যাওয়ায়।

এই বাজারে একজনের অন্ন যোগানো, ঘরে রেখে পোষা যে খরচ সাপেক্ষ তা বুঝেছে। তাই নিভার চলে যাবার কথায় মামীমা বলে।

—তা বাপু, তোর মা যখন লিখেছে কলকাতায় যাবি বৈকি। না হলে ঘর-বাড়ি বিষয়-আশায়ও বেহাত হয়ে যাবে।

তারজন্য হোক বা নাহোক তবু নিভাকে যেতে হচ্ছে কলকাতায়, কারণ আজকের দিনে মেয়েদেরও নিজেদেরই বাঁচার পথ খুঁজে নিতে হয়। এই জীবনসংগ্রাম কাউকেও মুক্তি দেয় না।

নিভা তাই নিজের বাঁচার জন্যই চলে যাচ্ছে কলকাতায়।

ইরা বলে—তাহলে চল্লি তুই ?

নিভা বলে—এখানে এই মফঃস্বল শহরে থেকে কি হবে বল? বাঁচার লড়াই যদি করতেই হয় কলকাতাতেই করবো। তুই ও ছাখ, এখানে যদি কিছু না মেলে কলকাতায় চলে আসবি। ঠিকানা তো রইল।

ইরা ক্রমশঃ বুঝেছে বর্ধমানের মত ছোট শহরে তেমন কিছু সুযোগ সুবিধা তার জন্য নেই। হন্যে হয়ে শহরের দু'একটা অফিসে ঘুরেছে। যদি চাকরী বাকরী কিছু মেলে। কিন্তু দেখেছে ইরা শহরের একটা চক্র, গোষ্ঠীই এখানের সুবিধার চাবিটা দখল করে রেখেছে।

আর তারা যে সহজ ব্যক্তি নন তাও বুঝেছে এর মধ্যেই। কিন্তু সেই চক্রের চাঁইদের কাছে পৌঁছানোও বেশ কঠিন।

নরেশবাবুও রিটায়ার করে এখন অভাবের মধ্যে পড়েছে। দেখে ইরা সকালে বের হয়। ফেরে সেই দুপুর গড়িয়ে।

জিজ্ঞাসা করে নরেশবাবু—কিছু খবর পেলি মা ?

ইরা শুক্নো গলায় জানায়—দেখছি চেষ্টা করে।

—ভবতোষ বাবুর ওখানে গেছলি ?

ভবতোষবাবু শহরের নামী কনট্রাকটার, ফুড কর্পোরেশনের এজেণ্ট। শহরের অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। ইচ্ছে করলে কিছু করতে পারেন।

ইরা ক'দিনই যাতায়াত করছে ওর ওখানে।

বিরাট বাড়ি। ক'দিন যাতায়াতের পর একজন বলে ইরাকে। —সন্ধ্যার পর এসো, দেখা হবে ওর সঙ্গে।

ইরা দেখছে লোকটাকে। ভারি চেহারা—ইয়া একজোড়া গোঁফ। লোকটা কেমন বিশ্রীভাবে হেসে বলে,

—কাজ করাতে গেলে দাম দিতে হয়। তা তুমি তো দেখতে শুনতে ভালোই, বেশ ইয়ে ইয়ে—

অজানা ভয়ে শিউরে ওঠে ইরা।

ওর দুচোখ যেন শিয়ালের মত জ্বলছে। লোকটা বলে—তোমার হয়ে যাবে, কিন্তু—

ইরা সরে আসে পায়ে পায়ে।

মনে হয় চারিদিকে যেন ওমনি শয়তানের দল ওৎ পেতে আছে, ওদের মত অসহায় মেয়েদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। এমনি অন্ধকার অতলে হারিয়ে যাওয়া ছাড়া বাঁচার আর কোন পথ যেন খোলা নেই।

মনে পড়ে নিভার কথা। নিভা কলকাতায় গিয়ে চিঠি দিয়েছে। ওখানে কোথায় চাকরীও পেয়েছে নিভা। ইরাকেও যেতে লেখে প্রায়। কিন্তু ইরা এখানেই একটা কিছু করে বাঁচার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এবার মনে হয় এখানে আর কোন পথই খোলা নেই।

তাই শেষ অবলম্বন হিসাবে কলকাতায় নিভাকেই চিঠি দেয়। এখান থেকে চলে যাবে কলকাতায়—ওই মহানগরেই।

নরেশবাবু মেয়ের দিকে চেয়ে থাকে। এখন আর শুধোয় না কিছু হলো কি না। সেও জেনেছে এখানে কিছু হবে না।

ইরা বলে—কলকাতাতেই চলে যাবো ভাবছি বাবা। নিভাকে চিঠি দিলাম।

কয়েকদিন পরই নিভার চিঠি এসেছে। কলকাতায় ইরার জন্য একটা ব্যবস্থা হয়েছে, আপাততঃ সেখানেই যোগ দিক। তারপর ভালো কিছু হবে। আর থাকার ব্যবস্থাও হয়েছে।

নরেশবাবু মেয়ের কথায় চাইল, ইরার মা-ও খবরটা শুনেছে। সংসারের খর্চাও বেড়েছে, এদিকে স্বামীর রোজগার নেই। ফলে কলসীর জলের মত ব্যাঙ্কে রাখা সামান্য টাকাও ক্ষয়ে ক্ষয়ে আসছে। কিন্তু সংসারে অভাবটা বিরাট একটা ক্ষুধার্ত প্রাণীর মত সব কিছুকে গিলে চলেছে। তাই কলকাতায় মেয়ের চাকরীর কথা শুনে মা বলে,

—যাক না কলকাতায়। এখন তো সেখানে মেয়েরাও কত কি কাজ করছে।

নরেশবাবু কি ভাবছে। আজকাল এসবই করতে হচ্ছে মেয়েদেরও। স্ত্রী ঠিকই বলেছে। তবু ওই কঠিন সত্যটাকে মেনে নিতে ভয় হয়।

নরেশবাবু নিরীহ, ভীরু ধরনের মানুষ। নিজের কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন, তাই কর্তব্য পালনের সাধ্য নেই বলে মেয়ের কাছে সে যেন নিজেকে অপরাধী বলে মনে করে তাই বলে নরেশবাবু।

—একা মেয়েকে কলকাতার মত জায়গায় পাঠাবো ইরার মা?

মা বলে—কেন? সেখানে কি বাঘ না ভালুক আছে যে তোমার মেয়েকে খেয়ে ফেলবে? তাছাড়া নিভা ওর বন্ধু, তার কাছেই থাকবে। এত ভয় কিসের বাপু? আর কি কেউ কলকাতা যাচ্ছেনা?

নরেশবাবু তবুও ওই যুক্তিটাকে মেনে নিতে পারে না। কি ভাবছে সে। মা বলে—লেখাপড়া শিখিয়েছো, দুটো পয়সা দিয়ে যদি সংসারকে বাঁচায় সেটা কি খারাপ? আমি বলছি ও যাবে। তুমি আর অমত করোনা। দেখছো তো সংসারের হাল।

নরেশবাবু আর বাধা দিতে পারেনি।

ইরাও কলকাতায় চলেছে।

একটা অজানা ভয় যে করেনি ইরার তা নয়। ট্রেনটা মাঠ-প্রান্তর সবুজক্ষেত পার হয়ে আসছে মহানগরীর দেশে। একটি মেয়ে চলছে তার ভাগ্য অন্বেষণে কলকাতায়। পিছনে পড়ে রইল তার শহর, বাবা মা। আজ বাইরের জগতে সে হারিয়ে গেল। যেভাবে হোক

বাঁচতে হবে তাকে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। আকাশের কোলে দেখা যায় রোদে ঝকঝক করছে বিশাল লোহার ঝুলন্ত খাঁচার মত হাওড়ার ব্রিজটা।

জলস্রোত যেন আছড়ে পড়েছে তীরভূমিতে। ট্রেনটা এসে থামতে লোকজন নামছে। ওই ভিড়ে ইরা যেন হারিয়ে গেছে। কোনদিকে যাবে ঠিক ঠাওর করতে পারেনা, বিশাল শহরের কিছু তেমন চেনেও না। এদিক ওদিক খুঁজছে নিভাকে।

হঠাৎ নিভার ডাকে চমকে ওঠে—এসেছিস তাহলে?

অকুলে যেন ভরসা পায় ইরা।

নিভা ওই জনস্রোত থেকে ওকে একটু তফাৎ-এ সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে, ওদিকে দাঁড়ানো দামী স্যুটপরা একটি তরুণকে দেখিয়ে বলে—এই প্রশান্ত, প্রশান্ত—এই আমার বন্ধু ইরা।

ইরা দেখছে প্রশান্তকে। নিভার কোন দূর সম্পর্কের আত্মীয়, এর কথা নিভাও লিখেছিল ইরাকে। এই প্রশান্তদাই নাকি তার কোন পরিচিত ব্যবসায়ীকে বলে ইরার একটা চাকরীর ব্যবস্থা করেছে। তাই ইরা ওর কাছেও কৃতজ্ঞ। ইরা হাতজোড় করে নমস্কার জানায়।

প্রশান্ত বলে, চলো একটা টাক্সি নিয়ে বাসায় পৌঁছে দিই তোমাদের। আমার একটা জরুরী এপয়ণ্টমেণ্ট আছে বেলা দুটোয়। তোমাদের ছেড়ে দিয়ে সেখানে যাবো।

মহানগরীতে এসে হাজির হলো ওই হাজারো মানুষের ভিড়ে সামিল হয়ে একটি মেয়ে ভীরু পদক্ষেপে। আজব শহরের তাতে কোন আপত্তি স্বীকৃতিও নেই। নির্বিকার এ শহর।

দক্ষিণ কলকাতার লেকের কাছাকাছি অঞ্চলে একটা ফ্ল্যাটবাড়ির একটা দু'কামরার ছোট ফ্ল্যাটে নিভা আশ্রয় নিয়েছে। ও কোন নামী কোম্পানীর সেলস্-এ কাজ করে। প্রায় মাঝে মাঝে ওকে

সেলস্ প্রমোশনের কাজে কলকাতার বাইরে যেতে হয়, ফ্লাট বন্ধ থাকে। আর একা একা থাকতেও ভালো লাগেনা।

এখানে এসে নিভা এখন মায়ের কাছেও যায় মাঝে মাঝে। দেখেছে সৎমায়ের বয়স হয়েছে আগেকার সেই ঝালটাও তেমন নেই। একমাত্র সন্তান সেও এখন আমেরিকা প্রবাসী। সৎমা ছেলের প্রবাসে চলে যাওয়ায় নিঃসঙ্গ, তাই সৎমেয়েকেও এখম অন্যচোখে দেখে। বলে ঊষা দেবী।

—এখানেই চলে আয় নিভা। এতবড় বাড়ি পড়ে আছে। আর কে আছে আমার বল ? তোর ভাইতো আর এদেশে আসবে বলে মনে হয় না।

নিভা সৎমায়ের কথাটাও ভাবে, বলে সে,—এইতো আসছি, যাচ্ছি মা। দেখি—তারপর ফ্লাটটা ছেড়ে দেব কিনা।

নিভার এই ফ্ল্যাটে থাকার ঠিক নেই। তাই ইরাকেই একটা ঘরে এনেছে, তবু ফ্লাটটার দেখভাল হবে, ছিমছাম সাজানো ফ্লাট, সুন্দর বাথরুম। নিভা সেদিকে বেশ সৌখীন, বাথরুমে বাথটাব। মোজাইকের মেঝে, এঘরেও একটা খাট রয়েছে। লাগোয়া রান্নাঘরে গ্যাসের ওভেন।

ইরা সব দেখেশুনে অবাকই হয়। মনে হয় নিভা ভালোই রোজগার করে। তারও মনে হয় সেও এমনি একটা ফ্ল্যাটে থাকবে। মা বাবাকেও আনবে এখানে।

নিভা বলে—স্নান টান করে নে ইরা। ফ্রিজে খাবার আছে, গরম করে নিচ্ছি। প্রশান্তদা, তুমিও খেয়ে যাও।

প্রশান্ত ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বলে সে—ওরে বাবাঃ, একটা বেজে গেছে। দুটোয় এ্যাপয়ণ্টমেণ্ট। আমি দৌড়ালাম। পরে আসবো। চলি ইরা—

প্রশান্ত চলে যেতে ইরা বলে

—বেশ হাসিখুশী ভদ্রলোক তো তোর প্রশান্তদা ! ভালো চাকরী করেন বুঝি ?

নিভা বলে—ওর কিসব সাপ্লাই, এক্সপোর্টের ব্যবসা। দিনরাতই দৌড়চ্ছে ওই নিয়ে নাওয়া খাওয়ারও সময় নেই। তুই স্নান সেরে নে। খেয়ে দেয়ে রেষ্ট নিবি, আমি একবার অফিসে যাবো।

ইরা ভয়ে ভয়ে বলে—আমার ব্যবস্থা! একটা কাজতো চাইরে।

হাসে নিভা—সে হয়ে আছে। কাল সকালেই যাবি সেখানে।

ইরা ফ্ল্যাটে একাই রয়েছে। কলকাতায় তাব এই প্রথম বসবাস।

নিভা তার অফিসে চলে গেছে। ইরা ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে এদিকের ব্যালকনি থেকে নীচের চলমান জনস্রোতের দিকে চেয়ে থাকে। হাজারো মানুষ চলেছে। শুধু জানেনা ইরা এখানে তার জন্য কি ভাগ্য অপেক্ষা করছে। তবে মনে হয় কলকাতা শহর কাউকে ফেরায় না, এর বেসাতির হাটে যার যেমন যোগ্যতা সে ঠিক সেটুকু রোজগার করতে পারে।

তাকেও সেই যোগ্যতা অর্জন করতেই হবে। সে যেভাবেই হোক।

বৈকাল নামছে। ফ্লাটটা তিনতলার ওপর। সামনে একটা ব্যালকনিও আছে। ওখান থেকে লেকের সবুজ গাছ-গাছালির ফাঁকে বিরাট জলাশয়ের কিছুটা দেখা যায়। রাস্তায় মন্থর গতিতে গাড়িগুলো চলেছে, লোকজন ছেলে মেয়েদেরও ভিড় দেখা যায়। মাঠের ধারে অনেকে ঘুরছে। ওই চলমান জীবনের সামিল হতেই এসেছে ইরা। এই পড়ন্ত রোদে ওই জনতা, গাছ-গাছালির ভিড় কর্মব্যস্ততা দেখে ভালো লাগে ইরার, কলকাতাকে ভালো লাগে তার।

নিভা আর প্রশান্ত ফিরেছে সন্ধ্যার মুখেই। নিভা বলে—একা একা কি করছিস ইরা?

প্রশান্ত বলে—তোমার বান্ধবী বোধহয় কবিতা লিখছিল। আর ও যদি কবিতা লেখে সম্পাদকদের অনেকেই কাৎ হয়ে যাবে।

—কেন? ইরা শুধোয়।

প্রশান্ত বলে—সুন্দর হাতে সুন্দর কবিতাই বের হবে।

ইরা ওর রূপের সম্বন্ধে ইদানীং কিছুটা সচেতন হয়েছে। তাই ওর রূপের প্রশংসা শুনে মনে মনে খুশীই হয়। মুখে কিছু বলে না।

নিভা বলে—খুব তোষামোদ করতে পারো কিন্তু প্রশান্ত। এরপর কি বলবে তা জানি?

প্রশান্ত বলে—তাহলে বলার আগেই সেটা হয়ে যাক। মিষ্টি হাতের এক কাপ চা।

ইরাও হেসে ফেলে চা করতে যায়। প্রশান্তকে ভালো লাগে তার। বেশ সহজ সরল, পরোপকারী ছেলে, আর সহজেই সকলের সঙ্গে মিশে যেতে পারে সে।

পরদিন ইরা বের হয়েছে প্রশান্ত আর নিভার সঙ্গে। নিউমার্কেটের এদিকে বড়সড় একটা দোকানে এসে ঢুকলো।

বিরাট হলঘরই, বাইরের গরম বাতাস-এর এখানে প্রবেশ নিষেধ। বড় বড় কাঁচ-এর শোকেস-এ রকমারি ডিজাইনের পোষাক সাজানো, রং পালিশ করা মেয়েরা সেইসব পোষাক কেনাকাটা করছে। কাউন্টারে সেলস্ গার্লরাও ব্যস্ত। ইরা যেন হঠাৎ এক স্বপ্নজগতে এসে পড়েছে। এখানে কোন অভাব নেই, প্রাচুর্যের দেশ। যেন পরীরা বিচিত্র সাজে সেজে ডানা মেলে ঘুরছে।

ওদিকে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে। নিভা বিস্মিত ইরাকে ওই সিঁড়ি দিয়ে উপরে নিয়ে গেল---ওদিকের একটা কাঁচের ঘরে।

মিস জালান বেশ কিছুদিন গারমেণ্ট-পোষাক-এর ব্যবসা করছে, এর মধ্যে তার কারখানায় তৈরী বিভিন্ন ডিজাইনের পোষাক—বিভিন্ন মডেলের নতুন জামা-শাড়ি দেশে কেন, বিদেশের বাজারেও সাড়া এনেছে, ব্যবসাও বেড়েছে তার।

প্রশান্ত বলে—হ্যাল্লো মিস জালান! এই সেই মেয়েটি ইরা সেন।

মিস্ জালান পাকা ব্যবসাদার। ওদের দেখে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

—বসো, বসো।

বেল টিপতে বেয়ারা আসে। মিস জালান শুধোয়—কি নেবে? ঠাণ্ডা না গরম?

প্রশান্ত বলে—যা হোক। এনিথিং।

কফির অর্ডার দিয়ে মিস্ জালান সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখছে ওই ইরাকে। ওর দেহের গঠন, বুক—নিটোল হাত, সুন্দর মুখশ্রী তার চোখে লেগেছে। মনে মনে হিসাব করে নেয় মিস্ জালান, শুধু অফিসের কাজই নয়, ওকে দিয়ে মডেলিং করানোও যেতে পারে। ইরার দেহের অনাবিষ্কৃত সৌন্দর্যকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করে মিস্ জালান তার চোখ দিয়ে।

প্রশান্ত বলে—তাহলে ইরার ব্যবস্থার কি হবে?

ইরাও দেখছে এই স্বপ্নজগৎকে। এ সব কিছুই ছিল তার আকাঙ্ক্ষা। মিস্ জালানের উপরেই তার কলকাতার থাকার ব্যাপারটা নির্ভর করছে। মিস্ জালানও তাকে হতাশ করেনি। বলে সে,

—ও-কে। তোমার লোক, রাখছি ওকে। কাজকর্ম শিখুক—

ইরার স্বস্তি ফিরে আসে।

প্রশান্ত বলে—মেনি থ্যাঙ্কস্ মিস্ জালান। জানতাম তুমি ওকে একটা চাকরী দেবেই। অনেক ধন্যবাদ।

প্রশান্ত মিস জালানের দোকান থেকে বের হয়েছে নিভা আর ইরাকে নিয়ে। তখন নিউমার্কেটে সন্ধ্যা নেমেছে।

মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে চারিদিক দেখছে ইরা।

এ তার কাছে নতুন এক জগৎ। মেয়েদের পোষাকের আর যৌবনবতী দেহের যেন প্রদর্শনী চলেছে। ইরার প্রথমে যেন এসব দেখতেও লজ্জা করতো। নারীদেহের এ-সব নির্লজ্জ বেসাতিরই নামান্তর মাত্র।

কিন্তু ক্রমশঃ দেখছে এই উছল আবেগময় প্রদর্শনী এই সমাজের

অগ্রগতিরই পরিচয়। মিস জালানের শো কেসেও দেখছে সেই ব্যাপার। ইরার মনে হয় এই সমাজে থাকতে গেলে তাকেও এসব মেনে নিতে হবে।

প্রশান্ত ওদের নিয়ে এসেছে একটা দামী রেস্তোরায়। বিরাট হলঘরে সারবন্দী টেবিল সাজানো। মৃদু রহস্যময় আলোয় হলটা যেন স্বপ্নপুরীতে পরিণত হয়েছে। ইউনিফর্ম পরা বেয়ারার দল ব্যস্ত হয়ে ঘুরছে।

প্রশান্ত বলে—মিস জালানকে কেমন লাগলো ইরা?

ইরা বলে ভালোই।

প্রশান্ত শোনায়—রিয়েল ব্যবসাদার ওই ভদ্রমহিলা। তবে ওর সোর্স অনেক। ওকে খুশী করতে পারলে আখেরে ভালোই হবে।

অর্থাৎ ইরা যেন ওই মহিলার কথা মেনে চলে এই ইঙ্গিতই দিতে চায় প্রশান্ত।

নিভা বলে—এমন জড়সড় হয়ে থাকবিনা ইরা। ওই মফঃস্বলী ভাবটা ছেড়ে এখানে ফ্রি হয়ে থাকতে হবে। আর মডেলিং করতে যদি পারিস তোর রোজগার ভালোই হবে।

প্রশান্ত হাসে। বলে সে,

—মেয়েরা সহজেই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে।

ইরাও নেবে। আর নিভা—তোমার তালিম পেলে ইরা ঠিক মানিয়ে নেবে এখানেও।

ইরা হাসলো।

তার সামনে এখন এক নতুন চ্যালেঞ্জই। তাকে এই মহানগরীর নতুন জীবনে মানিয়ে নিতে হবে। আর এ সে পারবেই। ইরা বলে,

—চেষ্টা করবো প্রশান্তবাবু। আপনার কাছেও আমার অনেক ঋণ।

প্রশান্ত খুশী হয়। বলে সে,

—আরে ওসব ঋণ টিন এর কথা ছাড়ো ইরা। বন্ধুকৃত্যতো করতে হয়। এ তাই ধরে নাও।

বেয়ারা খাবার এনেছে। ইরা দেখছে ওই দামী খাবার গুলোকে। এখানে গোগ্রাসে কেউ খায় না। খাবার রীতি ও আলাদা।

কলকাতার এই বিলাস প্রাচুর্যের জীবনটাকেই দেখেছে ইরা। সন্ধ্যার পর দেখেছে চৌরঙ্গী পার্কষ্ট্রীট অঞ্চলের রূপই বদলে যায়।

ইরা এখন চাকরীতে ঢুকেছে।

ছুটির পর কোন কোনদিন এসে পড়ে প্রশান্ত। ইরা বলে—বাড়ি ফিরতে হবে।

হাসে প্রশান্ত—বাড়ি! ঠিক আছে। চল, একটু ঘুরে ফিরে পৌছে দেব তোমাকে। কলকাতাটা একটু চেনো! জানো।

প্রশান্তর সঙ্গেই যায় কোন কাফেতে, নাহয় বারে। ইরা এখন সহজ হয়ে উঠছে।

দেখেছে স্বপ্নআলোকিত ওই বারের হলে মদের ফোয়ারা ছোটে, ধোঁয়ায় যেন দমবন্ধ করা পরিবেশ। তারই মাঝে ডায়াসে নাচছে একটি স্বল্পবাসা মেয়ে, তার দেহের সব সম্পদই যে প্রকাশ্যে পুরুষের দরবারে দেখাতে চায় সে।

নির্লজ্জ পুরুষের মনের আদিম কামনার এই নগ্ন প্রকাশ দেখে শিউরে ওঠে ইরা। বলে—চলুন প্রশান্তদা!

হাসে প্রশান্ত—ভয় পাচ্ছো নাকি? ঠিক আছে চলো! একটু ময়দান ঘুরেই যাবো। এখন বাড়ি ফিরে কি হবে।

গড়ের মাঠটুকু কলকাতার ঘিঞ্জী—দেহের যেন ফুসফুস। এখানেই হাওয়াটুকু চলাচল করে, দিনের আলো—রাতের চাঁদের আলোর সাড়া জাগে এখানে।

শহর কলকাতার উত্তরে তার বার্দ্ধক্য, সেখানে সর্বত্র বয়সের ছাপ, পুরানো দিনের বেদনাময় স্মৃতির ভিড়। জীর্ণ বাড়ি— ভাঙ্গা রাস্তা—ঘিঞ্জি মানুষের ভিড়।

দক্ষিণে তার যৌবন এর দাক্ষিণ্য।

চাঞ্চল্যের সাড়া। আর গড়ের মাঠে তার হৃৎপিণ্ড।

সন্ধ্যার পর এখানের সবুজ গাছগাছালি ঘেরা মাঠে জমেছে ভ্রমণার্থীদের ভিড়। গাড়ি রেখে এখান ওখানে ঘুরছে অনেকে।

ইরাও এখন শহরের এই মানুষদের একজন হয়ে গেছে। তার পরণে আধুনিক ষ্টাইলের শাড়ি, সর্ট ব্লাউজে তার যৌবনবতী দেহের উছল আভাষ।

প্রশান্ত আর সে বসে আছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের পুকুরের ধারে। মাতাল চাঁদের আলো চমকে ওঠে পুকুরের জলে—ইরার মুখে তারই বিচ্ছুরণ। প্রশান্ত দেখছে ইরাকে। বলে সে—চুপ করে আছো যে ইরা?

ইরা চাইল। দেখছে সে প্রশান্তকে। প্রশান্ত কি যেন বলতে চায় তাকে এই নিভৃত নিরালায়। ইরার কেমন সঙ্কোচ বোধ হয়।

ইরা এই ক'মাসে যেটুকু দেখেছে তাতে মনে হয়েছে তার প্রশান্তকে ভালোবাসে নিভা। ওদের তুজনের ঘনিষ্ঠতা ইরার নজর এড়ায়নি।

নিভাও হয়তো ভালোবাসে প্রশান্তকে। ইরা নিভার কাছে কৃতজ্ঞ। সেইই তাকে বৰ্দ্ধমান থেকে এনে এখানে এই মহানগরীতে আশ্রয় দিয়েছে, তার জন্য চাকরীর ব্যবস্থাও করেছে।

নিভার প্রিয়জন ওই প্রশান্তকে সে ভাঙ্গিয়ে নিতে পারবে না। তাই প্রশান্তর দিকে চেয়ে বলে ইরা।

—চলুন। এই রাজরাণীর প্রাসাদের এখানে আমার মত খেটে খাওয়া মানুষের ঠাই নেই। রাজা রাজড়ার ব্যাপার—

হাসে প্রশান্ত।

ইরা বলে—সত্যি! বৰ্দ্ধমানের রাজাদেরও দেখেছি। তাদের ব্যাপার স্যাপারই আলাদা। একজন রাণীতে মন ভরতো না।

হাসে প্রশান্ত। বলে সে—তা সত্যিই। আজকাল রাজারা না থাকলেও অন্য রাজারা আছে। আর সেই হারানো দিনের সাক্ষী আমিও।

—কেন? ইরা শুধোয়।

প্রশান্ত বলে—আমি ভূতপূর্ব নলদা রাজ পরিবারের সন্তান! আজ রাজ্যহারা যুবরাজই বলতে পারো ইরা। আমাদের বংশের পিতৃপুরুষদের একাধিক রাণীই ছিল। আমাদের ভালোবাসা এত ব্যাপক যে একটি নারীতেই তা সীমিত থাকেনা। তোমার বান্ধবীর প্রেমের ভাণ্ডার পূর্ণ থাকবেই, ভয় পেয়োনা। ইরা চুপ করে থাকে। ওর মনে বিস্ময় লাগে।

—আপনি রাজফ্যামিলির ছেলে তা অবশ্য জানতাম না।

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে প্রশান্ত। বলে সে,

—ওসব এখন রূপকথা। একবার নিয়ে যাবো তোমাকে আমাদের প্যালেসে। এখনও কিছু রেয়ার তৈলচিত্র আছে। দুচার লাখটাকা দাম দিতে চায় কোন মিউজিয়াম, হাতির দাঁতেরও অনেক কাজ আছে, বেচলে বাকী জীবনটা এইভাবে খেটে খেতে হতোনা। কিছু সোনার জিনিষও আছে ভল্টে। তাই বিক্রী করে প্যালেস এখনও বজায় রেখেছি মাত্র।

ইরার দুচোখে বিস্ময় জাগে। প্রশান্ত যেন তার কাছে এক স্বপ্নের রাজপুত্রই।

···তবু বর্দ্ধমানের সেই গাছগাছালি ঘেরা বাড়ি, বাবা মায়ের কথা, ভাইদের কথা ভোলেনি ইরা। নরেশবাবুও নিশ্চিন্ত হয়েছে কিছুটা। মাস গেলে শ'তিনেক টাকা ঠিক আসছে। সংসারেরও তাতে সাশ্রয় বেশ কিছুটা হয়। নরেশবাবুও কিছুটা নিশ্চিন্ত।

মায়ের মন তবু ব্যাকুল হয় মাঝে মাঝে। বলে সে—

—ক'মাস গেছে ইরা, কেমন আছে সে কে জানে।

নরেশবাবু বলে—কাজকর্ম করছে, চিঠিও দেয়। টাকাও আসছে ফি মাসে। ভালোই আছে। লিখেছে চাকরীর ছুটি কম—তাই আসতে পারছে না।

মা বলে—তাই বলে বর্দ্ধমান কি এমন দূর যে একদিনের জন্যও

বাপ-মাকে চোখের দেখা দেখতে আসার সময় নেই? তুমি একবার আসতে বলো ওকে, কতদিন দেখিনি।

ইরা ক্রমশঃ কলকাতার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে নিজেকে।

এর রূপের রোশনী বড়ই মোহময়ী, বহু পতঙ্গ এর আগুনে পড়েছে আর পুড়েছে।

কলকাতার জীবনে ভালো মন্দেরও আবর্ত আছে। যে ভালোর মধ্যে পড়েছে সে জীবনের পথটাকে সেইদিকেই নিয়ে গেছে, আর যে এর মোহকুহকে পড়েছে ধাপে ধাপে সে হারিয়ে গেছে এ জৌলুসে। ইরার চোখে অনেক পাবার স্বপ্ন, ক্রমশঃ প্রশান্তও তার মনের সেই অনেক পাবার স্বপ্নটাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

নিভা কয়েকদিন ধরে খুবই ব্যস্ত।

তাকে অফিসের কাজে দিল্লী যেতে হয়েছিল। ফ্ল্যাটে থাকে একা ইরাই।

প্রশান্তও আসে। দুজনে ফেরার সময় চৌরঙ্গীপাড়ার কোন রেস্তোরায় খেয়ে নেয়। ইরা প্রথমে এড়াবার চেষ্টাই করছিল প্রশান্তকে। কারণটা সে জানে, কর্মব্যস্ত জীবন নিভার, তাই হয়তো প্রশান্তকে সবসময় কাছে পায় না।

ইরা সেই প্রশান্তকে নিভার জীবন থেকে সরিয়ে নিতে চায় না। তাই এড়িয়ে থাকে।

প্রশান্তকে তবু যেন এড়ানো যায় না।

সেদিন নিভা বাইরে। প্রশান্ত সন্ধ্যার পর বেশ কিছু চীজ, মটন-ড্রেসড চিকেন নিয়ে এসেছে ইরাদের ফ্ল্যাটে। আর কিছু সন্দেশের বাক্স মালা ফুল।

—কি ব্যাপার! ইরা দরজা খুলে ওকে দেখে অবাক হয়।

প্রশান্ত বলে—বাইরেই দাঁড় করিয়ে রাখবে নাকি! তোমার জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে এলাম—

মনে পড়ে ইরার। আজ তার জন্মদিনই। মা বাড়িতে পায়েস

করে দিত। নতুন শাড়ি পরে মাকে প্রণাম করতো ইরা। আজ মনেই ছিল না। তবু প্রশান্তকে এসব আনতে দেখে খুশী হয়।

—আসুন! ধন্যবাদ।

প্রশান্ত বলে—বেশ জমিয়ে রান্না করো, জন্মদিনের ভোজটা যেন যুৎসই হয় ইরা। তোমার অনুমতি নিয়ে ততক্ষণে গলাটা একটু ভিজিয়ে নি।

প্রশান্ত একটা ছোট মদের বোতল বের করে।

ইরা ক্রমশঃ এসব দেখতে অভ্যস্ত হয়েছে। বলে সে—বেশী খেও না কিন্তু। নিভা নেই—তুমি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছো প্রশান্তদা।

প্রশান্ত বলে—নিভা ও জানে এসব ইরা।

—তাই নাকি! ইরা অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে কথাটা বলে। জানায় সে—ঠিক আছে, ফিরুক বলবো।

নিভা ক'দিনের জন্য অফিসের কাজে দিল্লীতে গেছে। সরকারী অফিসে তাদের কোম্পানীর অনেক কাজ। নানা দেবতাকে নানা ভাবে পুজো দিয়ে সেই কাজ করাতে হয়। হঠাৎ সেখানেই টেলিগ্রাম পেয়ে দিল্লীর কাজ ফেলে রেখে নিভাকে কলকাতার বাড়িতে আসতে হয়েছে। তার সৎমা উষাদেবীর শরীরটা কিছুদিন ধরে ভালো যাচ্ছে না। ডাক্তার বৈদ্য দেখছে, কিন্তু ভদ্রমহিলা একাই। একমাত্র ছেলেও আমেরিকায়। সেখানের নাগরিকত্ব নিয়ে রয়ে গেছে।

উষাদেবীর এখানে আপন বলতে ওই নিভাই। একদিন যাকে পর করে দেবার কথা ভেবেছিল সেই নিভাই এখন তার একমাত্র ভরসা।

নিভার জীবনে তেমন কেউ আসেনি। তার রূপ গুণ না থাক কিন্তু একটা ব্যক্তিত্ব তার আছে। তাই বোধহয় পুরুষদের সে পাত্তা দেয় না। প্রশান্ত এসেছিল নিভার জীবনে সত্যি। বর্দ্ধমান থেকে আসার পর নিভা তার সঙ্গে কোন পার্টিতে পরিচিত হয়েছিল।

প্রশান্ত এসেছে এ বাড়িতে তার সঙ্গে। কিন্তু তাদের পরিচয় একটা পর্য্যায়ে এসে থেমে গেছে। আর সেই জন্য নিভার ব্যক্তিত্বই দায়ী!

উষাদেবীও দেখেছে প্রশান্তকে নিভার সঙ্গে। আগে হলে উষাদেবী এনিয়ে মেয়ের সঙ্গে একহাত লড়ে যেতো, কিন্তু এখন সেও বদলে গেছে। বদলে গেছে পরিস্থিতি। এখন উষাদেবী নিভার উপরই নির্ভর করে আছে। তাই এনিয়ে কোন কথা বলেনি।

নিভাও এর জন্য মায়ের উপর খুশী। অতীতের সেই কর্কশ রুক্ষ মেয়েটির এই অসহায় অবস্থা দেখে নিভাও উষাদেবীকে করুণা করে।

আজ দিল্লী থেকে মায়ের বাড়াবাড়ির খবর শুনে থাকতে পারেনি নিভা। ছুটে এসেছে।

উষাদেবীর চিকিৎসার সব ব্যবস্থাই করে। উষাদেবী বলে—আর এসব করে লাভ কি নিভা। আমার দিন ফুরিয়েছে। এবার শান্তিতে যেতে দে মা।

নিভা বলে—এসব কথা ছাড়োতো মা।

—মা। উষাদেবী অবাক হয়। মনে মনে আজ খুশী হয় সে। নিভা তাকে ভুল বোঝেনি। উষাদেবী বলে—এসব বাড়ি ঘর তুই বুঝে নে মা। এতবড় বাড়ি পড়ে আছে আমার কখন কি হয়। তুই এবার বাড়িতে ফিরে আয় মা, না এলে জানবো মাকে এখনও ক্ষমা করিসনি তুই!

নিভা বলে—থামোতো মা! ঠিক আছে—তোমার কাছেই থাকবো এখন থেকে ফ্ল্যাট ছেড়ে।

—আর বিয়ে থা! উষাদেবী মেয়েকে সংসারী করাতে চায়?

নিভা বলে—ওসব পরে ভাবা যাবে। অর্থাৎ এড়িয়ে যেতে চায় সে। উষাদেবী বলে—প্রশান্ত ছেলে হিসেবে ভালোই, কত বড় বংশ ওদের।

নিভা বলে—এখন ঘুমোও তো। মেয়ের বিয়ের কথা ভেবে ঘুমও চলে গেছে দেখছি। অনেক রাত হয়েছে।

রাত অনেক হয়েছে। প্রশান্তরও খেয়াল নেই। ইরা রান্না শেষ করে নিজের হাতে টেবিল সাজিয়েছে।

—খাবে না? এসো।

প্রশান্ত বলে—খাবো না মানে? খাবার জন্য রাত কাবার করে বসে আছি। চলো।

ইরা রান্নাও ভালো করে। দেখছে ইরা প্রশান্তকে। হোটেলে থাকে। জানে ইরা সব হোটেলের রান্না একই ধরণের।

তাই নতুন খাবার খেয়ে প্রশান্ত খুব খুশি। বলে সে খেয়ে উঠে দারুণ!

তারপরই সমস্যাটা দেখা যায়। রাত দুপুরে আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামে। এ বৃষ্টি থামার নাম নেই। প্রশান্ত বলে—যেতে হবে হোটেলে।

ইরাও ভাবছে কথাটা।

স্তব্ধ রাত্রির বৃষ্টির গুঞ্জরণ—এলোমেলো বাতাসে ঝড়ের সংকেত। ইরা বলে—এই বৃষ্টিতে কোথায় যাবে?

—মানে! দেখছে ওকে প্রশান্ত।

আজ ইরার মনের অতলে ওমনি ঝড়ের আনাগোনা। দুজনে যেন অমনি ঝড়ের মাঝে হারিয়ে গেছে। ইরার বঞ্চিত ব্যর্থ নারী মনে কি বিচিত্র সুর ওঠে।

ঘুম ভাঙ্গে তখন সকাল। এক বিছানাতে শুয়ে আছে তারা। ইরা চমকে ওঠে। প্রশান্ত বলে—টেক্ ইট্ ইজি ইরা। চলি—

প্রশান্ত সকালেই বের হয়ে গেছে। ইরার দেহ মনে কি একটা আতঙ্ক, গতরাত্রের সেই ঘটনাগুলো কেমন অনায়াসেই ঘটে গেছে। প্রশান্ত এক অন্যজীবনের স্বাদ এনেছে ইরার মনে।

তাই হঠাৎ নিভাকে আসতে দেখে চাইল ইরা। মনে মনে ভয়ও পায়। নিভা বোধহয় টের পেয়েছে কিছু। কিন্তু নিশ্চিন্ত হয় ইরা। নিভা বলে—মায়ের অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে কাল এসেছি। একটা কথা ছিল রে!

ইরা চাইল। নিভা বলে—মায়ের অসুখ, বাড়িতেই থাকতে হবে। একা ফ্ল্যাটে থাকতে পারবি তো!

ইরা নিশ্চিন্ত হয়। এ যেন তার কাছে মুক্তির আশ্বাস। ইরা তবু সেই খুশী খুশী ভাবটা চেপে বলে—তুই এখানে থাকবি না?

—নারে! তবে আসবো মাঝে মাঝে। আর তুইও যাবি আমাদের বাড়ি। খুব দূর তো নয়।

ইরা বলে—কি আর করা যাবে। ঠিক আছে।

ইরা মনে মনে খুশীই হয়। প্রশান্ত যেন তার মনে এক নতুন সাড়া এনেছে। ইরা বদলে যাচ্ছে।

নিভা নিজের বাড়িতেই রয়েছে, এর আগে মাঝে মাঝে আসতো ইরার ফ্ল্যাটে, ফ্ল্যাটটা এখন ইরার। ভাড়াও দেয় ইরা। শুধু নামটা নিভার আছে। অবশ্য প্রথমে ইরা একটু বিপদেই পড়েছিল।

প্রশান্তকে সেদিন বলে—ফ্ল্যাটের পুরা ভাড়া দিতে হবে, নিভাতো থাকছে না।

প্রশান্ত খুশিই হয়। বলে সে—বেশ তো। ভাড়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। উপরন্তু লাভই থাকবে ইরা।

ইরা চাইল ওর কথায়। প্রশান্ত বলে—ফ্ল্যাটের ওদিকের ঘরটায় মডেলিং করো; ঠিক আছে ব্যবস্থা করছি।

এর কিছুদিন পর থেকেই ইরাও মডেলিং-এর কাজে নামে। দু-চারজন শিল্পী, ক্যামেরাম্যানও এসে যায়। দু-চারজন আধুনিকা তরুণীও আসতে থাকে। নানা পোষাকে—এমনকি পোষাকহীন ন্যুড ছবিও তোলা হতে থাকে।

ইরা ঠিক ভাবতে পারে না। মাঝে মাঝে দেখে প্রশান্ত গাড়িতে করে দু'একজন ভদ্রঘরেয় বৌ মেয়েদের আনে। ওদিকে ঘরে এসে হাজির হয়, কিছু আধবুড়ো তরুণ দল। হৈ চৈ চলে—মেয়েদের উছল হাসি, মদের গ্লাসের টুং টাং শব্দ ওঠে।

…টাকার লেন-দেনও হয়। আবার ঘণ্টা কয়েক পর ওই রঙ্গিনী—নাগরদের দল যে যার গাড়িতে হাওয়া হয়ে যায়।

নাহয় মেয়েদের জুয়োর আসর বসে। ইরা যেন কিছুটা বিব্রত বোধ করে। সে বেশ বুঝেছে এখানে মডেলিং-এর নামে দেহ বেশাতির ব্যবসাই যেন চলছে। ক্যামেরায় মডেলের ছবি নয়—নগ্ন মেয়ে-পুরুষের বিশ্রী ভঙ্গীর ব্লু-ফিল্মই তোলা হয়। ওই লোকদের ঠিক সে চেনে নি।

ইরা বলে প্রশান্তকে—এসব কি হচ্ছে প্রশান্ত?

প্রশান্ত হাসে। ইরার হাতে হাজার কয়েক টাকা তুলে দিয়ে বলে—ওরা, ওই টাকাওয়ালার দল ফুর্ত্তি করবে, তারজন্য টাকাও ওড়াবে। পারো তো কিছু ওমনি উড়িয়ে দেওয়া টাকা কুড়িয়ে নাও। আর তুমিও সমাজে বেশ ঠাঁই করেছো ইরা। এটাই বা কম কি?

ইরা ভাবছে কথাটা। তার মনের অতলে দুটো প্রশ্ন জাগে। একমন বলে সমাজের এই উদ্দাম বিলাস আর উচ্ছৃলতার স্রোতে ভেসে যেতে, অনেক কিছু পেতে।

আজ সে পাচ্ছে অনেকই। মিস্ জালানের শো রুমের চাকরীটা ছাড়েনি। এদিকে বাড়িতেও মডেলিং করাচ্ছে, ছোট খাটো মডেলিং ফার্মও করতে চায়। বর্দ্ধমানের সেই শান্ত জীবন থেকে এসে এখন শহর কলকাতার উদ্দাম জীবনের স্বাদ পেয়েছে।

হাল্কা রঙ্গীন মদের গোলাপী আমেজ তার মনের সব দুর্বলতাকে যেন দূর করে দেয়। আরও পেতে চায় সে। কিন্তু মনের অতলে অন্যমন কোথায় যেন কালো ঝড়ো মেঘের সন্ধান পায়। তার এসব ভালো লাগে না। এত সহজে এত পাওয়ার দাম একদিন দিতেই হবে আর তার জন্যে দিতে হবে অনেকই।

প্রশান্তও বুঝেছে ইরার মনের এই ঝড়টাকে। প্রশান্ত নানাভাবে জীবনকে দেখেছে। নিভাকেও দেখেছে কিন্তু তার চেয়ে ইরাকে বিভ্রান্ত করা অনেক সহজ। তাই এখন এই ফ্ল্যাটেও প্রশান্ত তার এইসব অন্ধকারের ব্যবসা শুরু করেছে।

এখন ইরাকে তার বেশী করে দরকার। তাই বলে—ওসব ভাবনা ছাড়োতো ইরা। টেক ইট ইজি মাই ডারলিং।

প্রশান্ত ওকে বুকে টেনে নেয়। ইরাও এখন প্রশান্তের উপর বেশ কিছুটা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। টাকা—প্রতিষ্ঠা—আর জীবনে কিছু উন্মাদনার স্বাদ পাবার জন্য আজ প্রশান্তকে ইরারও দরকার। আর প্রশান্ত ভাবছে ইরাকে যেন একটু বেশী প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছে।

ইরাও তার অন্ধকারের ব্যবসার অনেক খবর জেনেছে। দুজনে কি অদৃশ্য বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেছে।

প্রশান্ত ইরাকে ভালোবাসার ভান করলেও নিভাকে সে ভোলেনি। নিভাও প্রশান্তর সম্বন্ধে মনে মনে একটা দুর্বলতা পোষণ করে। স্বপ্ন দেখে নিভা প্রশান্তকে নিয়ে ঘর বাঁধবে।

নিভার মা উষাও সেই কথা ভাবে, বলে—প্রশান্ত ক'দিন আসেনি।

নিভা বলে—কাজে ব্যস্ত। বলবো ওকে আসতে।

প্রশান্ত ইরার কাছে নিভার খবরটা গোপনেই রাখে। ইরাও বদলে যাচ্ছে।

রাতের অন্ধকারে বর্দ্ধমানের সেই সহজ সরল মেয়েটি যেন আজকের ইরার খোলস থেকে বের হয়ে আসে। কোথায় একটা দুর্বার স্রোতে ভেসে চলেছে সে।

প্রশান্ত সেদিন এসেছে। মাঝে মাঝে প্রশান্ত আসে। তার আলমারিতে ব্রিফকেসটা রেখে বলে,

—একটু মাংস হোক। ভুঁই মত করো।

অর্থাৎ আজ রাতে এখানে থাকার ব্যবস্থাই যে করতে চায় সে। ইরা দেখছে ওকে। মাঝে মাঝে নিজেকে দোষী মনে হয় ইরার। বলে সে—নিভার খবর কি?

প্রশান্তকে মনে করিয়ে দিতে চায় ইরা যে সে নিভার কাছেই যেন যায়। প্রশান্ত এর মধ্যে একটা সুন্দর হার বের করে ইরার গলায় পরিয়ে দিতে চমকে ওঠে ইরা!

—একি!

হাসে প্রশান্ত—হার। নন্দার প্রিন্স প্রশান্ত প্রতাপ কি তার বন্ধুকে একটা হারও দিতে পারেনা তার জন্মদিনে?

অবাক হয় ইরা। মনে পড়ে আজ তার জন্মদিনই। পরে বাড়িতেও তার জন্মদিন কেউ পালন করেনি। বাবা মা-ও খবর রাখতোনা কবে তার জন্মদিন এল আর গেল।

প্রশান্ত সেই জন্মদিনের কথাটা মনে রেখেছে। খুশী হয় ইরা। তবু বলে—এত দামী হার,

হাসে প্রশান্ত—হ্যাটস্ নাথিং ডিয়ার।

কাছে টেনে নেয় ইরাকে। বলে—আরও কিছু পেতে হবে ইরা। এই সমাজে বহু বহু অপচয় হচ্ছে, আমরা তার কিছুটা হাতিয়ে নেব না কেন? এবার একটা গাড়ি কিনতে হবে। আর তুমিও নিজেই এবার চৌরঙ্গী পাড়ায় ঘর নিয়ে ফ্যাশন হল চালাবে—

—সত্যি! ইরা অনেক পাবার স্বপ্ন দেখে।

স্বপ্ন দেখে নিভাও। কথাটা ভেবেছে সেও। তাই প্রশান্তকেই নিয়ে এসেছে ডায়মণ্ডহারবারে, তার অফিসের কাজ সেরে ওরা ওখানের 'সাগরিকায়' উঠেছে। চাঁদনী রাত।

সামনের গাছগাছালি ঘেরা পথটা জনহীন হয়ে আছে, রূপালী আবেশ নামে নদীর জলে। নিভা আর প্রশান্ত বসে আছে নদীর ধারে।

নিভাই বলে—মা-ও চান এবার বিয়ে থা করি আমরা।

প্রশান্ত বলে—এত তাড়া কিসের ?

নিভা দেখছে ওকে। সেও জানে প্রশান্তকে। ওর ব্যবসাপত্র থেকে রোজগার ভালোই হয়। তবে কেমন বেপরোয়া স্বভাবের। নিভা বলে,

—তুমি কি ভয় পাচ্ছো ? আমিও ভালোই রোজগার করি,

প্রশান্ত বলে—না, না। কথাটা আমি ভাবছিলাম নিভা। মনে হয় তুমিই ঠিকই বলেছো।

নিভার সারা মনে কি আবেশ জাগে ওর নিবিড় ছোঁয়ায়। প্রশান্তের হাতে ওর হাতখানা।

হঠাৎ চেয়ে অবাক হয় নিভা। তার চাঁপাকলির মত সুন্দর আঙুলে প্রশান্ত একটা আংটি পরিয়েছে। দামী হীরা বসানো আংটি। চাঁদের আলো উছলে পড়ে ওই আংটি থেকে।

নিভা বলে - এত দামী আংটি।

হাসে প্রশান্ত। নিভাকে দু'হাত দিয়ে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ওর নরম নিটোল গালে ওর ঠোঁটের তীব্র উত্তাপময় স্পর্শ এঁকে দেয়। ঝড় ওঠে নিভার মনে। প্রশান্ত বলে—তোমার দামও কি কম নিভা ? তোমার আঙুলে ওই আংটিই মানাবে, তাই

নিভা স্বপ্নসায়রে যেন তলিয়ে যাচ্ছে। স্বপ্ন দেখে নিভা ওরা দুজনে ঘর বেঁধেছে।

রাত্রি নামে নদীর বুকে।

এই গঙ্গার আরও উজানে জব চার্ণকের গড়ে তোলা সেই মহানগরীতে তখন রাত্রির স্তব্ধতা নেমেছে। সাড়া জাগে লেকের ধারে গাছের পাতায়। দু'একটা রাতজাগা পাখী ডেকে আবার থেমে গেল। ইরা তার বেডরুমে গভীর ঘুমে মগ্ন।

তিনতলার সাজানো ফ্ল্যাটের ঘরে তখন দু'জন লোক খুবই ব্যস্ত। একজনের বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ, বেশ লম্বা। সারা শরীরে কঠিনতা, অন্যজন গোলগাল ধরনের। লোকদুটো সাবধানে ঘরে ঢুকে খাটে শোয়া মেয়েটির হাতদুটো চেপে ধরেছে, মেয়েটি জেগে ওঠে, কিছু বোঝবার আগেই অন্যজন তার মুখটা কি দিয়ে চেপে ধরে নাকের কাছে ভিজে তুলো শোঁকাতে থাকে। মেয়েটি দু'একবার নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে প্রাণপণে। কিন্তু পারে না।

ওই তীব্র ঝাঁঝালো ওষুধটা ইরার নিঃশ্বাসে মিশেছে, ক্রমশঃ তার চোখ বুজে আসে, হাতপায়ে ঝিম ধরে, তার প্রতিবাদের সব শক্তিটুকুও হারিয়ে যায়। তার জ্ঞানহীন দেহটা বিছানায় এলিয়ে পড়তেই গালকাটা সেই বলিষ্ঠ লোকটা মেয়েটির নরম মাখন রং-এর কণ্ঠদেশ টিপে ধরে তার লোহার সাঁড়াশীর মত দুটো হাত দিয়ে।

শহর কলকাতায় রাত্রির অন্ধকারে আজব নাটকই হয়। প্রেম-বিরহ-হত্যা আজব দৃশ্যই থাকে সেই নাটকে। এ যেন তারই খণ্ডচিত্র, মেয়েটি ছটফট করছে।

সঙ্গের সেই গোলগাল লোকটা বাধা দেবার চেষ্টা করে—ফটিক! এাই মরে যাবে যে—

ফটিক চাপা-স্বরে সাপের মত হিস হিস করে ওঠে—থামতো! নিকেশ করতেই হবে এটাকে। নাহলে বিপদ হবে।

জ্ঞানহীন মেয়েটার ঘাড়টা ভেঙ্গে গেছে।

—ধর! ন্যাপা নিয়ে চল।

ফটিকের কথায় ন্যাপাও মেয়েটাকে চ্যাংদোলা করে তুলে বাথরুমে ঢুকে সেই সুন্দরীর অর্দ্ধনগ্ন দেহটা বাথটাবে শুইয়ে দিল, আর ফটিকও রুমাল জড়ানো হাতে বাথটাবের কলটা খুলে দিতেই কলকলিয়ে জল বের হতে থাকে। বাথটাবে জল জমছে, ক্রমশঃ ভাসছে মেয়েটা। মরা দেহটাকে উপুর করে সেই জলে রেখে দেয় ফটিক। কিছুক্ষণের

মধ্যেই বাথটাব জলে টই টম্বুর হয়ে যাবে। নিখুঁত কাজ। মনে হবে ডুবেই মরেছে।

সব দেখে শুনে এবার লোকদুটো মাষ্টার কি দিয়ে ঘরের চাবি খুলে সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে তিনতলা থেকে। কেউ কোথাও নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লেকের ওদিকে দূরে গাছগাছালির ভিড়ে হারিয়ে যায় ছায়ামূর্তি দুটো।

ফটিক আর ন্যাপা দু'জনে কাজ শেষ করে এসে লেকের ঝোলানো ব্রিজের ধারে ফাঁকা হাওয়ায় দাঁড়িয়েছে। চারিদিকে কোথাও কেউ নেই। থমথমে রাত্রি।

ন্যাপা এর আগে মানুষ খুন করেনি। ফটিকের সঙ্গে এর আগে রাত বিরেতে দোকান লুট করা, চুরি, ডাকাতি এসব কাজে বের হয়েছে। কিন্তু খুন করেছে আজ।

ফটিককে দেখেছে সে ক'মাস মাত্র। চোলাই মদের ঠেকে ওদের আলাপ। ক্রমশঃ ফটিক ন্যাপাকে দু' একটা কাজে নিয়ে বের হয়েছে। আজও কিছু বলেনি ওকে ফটিক।

ফ্লাটে এর আগেও ওরা চুরি করেছে, আলমারী ভেঙ্গে। মালপত্রও অনেক পেয়েছে। সে সব মালপত্র ফটিক কোথায় পাচার করে তা জানেনা ন্যাপা। সে তার পাওনা মাত্র পঞ্চাশ টাকা নিয়েই খুশি ছিল। সামান্য পেলেই সে খুশী।

আজও সেই মতলবেই ন্যাপা ফটিকের সঙ্গে এসেছিল ওই ফ্লাটে। ওদের কাছে সবরকম তালার চাবিই থাকে। তাই দিয়ে দরজা খুলে ভিতরে এসে আলমারী না খুলে ফটিককে ওই খুন-খারাপি করতে দেখেই ন্যাপা ঘাবড়ে গেছে। সেও খুন করেছে একটি সুন্দরী মেয়েকে, কেন জানেনা। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই খুন করেছে সে।

হাতপা কাঁপছে তার। বের করে এনে ফটিক ন্যাপাকে ওর এই দুর্বলতা ঘোচাবার জন্যই মদ গিলিয়েছে লেকের ধারে। ভেবেছিল মদ

পেটে গেলেই ন্যাপার সাহস ফিরে আসবে। কিন্তু তা হয়নি। ন্যাপা বিড়বিড় করছে—খুন করলি ফটিক! তুই খুনী—আমাকেও খুনের ব্যাপারে জড়ালি? এ আমি করতে চাইনি—না!

—চোপ। ধমকে ওঠে ফটিক। বলে সে

—কাউকে বলবিনা। মুখ বুজে থাকবি শালা।

ন্যাপা গজগজ করে—খুন করালি আমাকে দিয়ে? খুন! তায় মেয়েছেলেকে।

গজগজ করছে ন্যাপা!—মহাপাপ করালি।

ফটিকও বিপদের গুরুত্ব বুঝেছে। এবার বিপদে ফেলবে ওই ন্যাপা। ফটিকের মুখে চোখে আদিম হিংস্রতা ফুটে ওঠে। ন্যাপা মদ গিলছে আর ওদিকে দাঁড়িয়ে গজগজ করছে। —পুলিশে যাবো। তুই শালা খুনী—পুলিশকে সব বলে দেব।

আর কোন কথাই বের হয় না ন্যাপার মুখ থেকে, পিছনের দিক থেকে ফটিক ওর মাথায় বেশ জম্পেশ একটা ঘা মারতেই কঠিন শব্দে ওর মাথাটা ফেটে যায়! রক্ত ঝরছে—সামনের দিকে টলে পড়তে যাবে ন্যাপার জ্ঞানহীন দেহটা, প্রচণ্ড এক লাথিতে ফটিক সেই পড়ন্ত দেহটাকে ব্রিজের উপর থেকে ছিটকে লেকের গভীর জলে ফেলে। রডটাকেও ছুঁড়ে ফেলে আরও গভীর জলে। বৃষ্টি নেমেছে।

লোকজন কেউ কোথাও নেই।

ফটিকও সেই অঝোর বৃষ্টির মধ্যে কাঠের ব্রিজ থেকে নেমে চলে গেল কোনদিকে। গহন কলকাতার বুকে কোথাও কোন সাড়া জাগে না। নির্বিকার চিত্তে মহানগরী এই হত্যার নাটক দেখছে নীরব দর্শকের মত। তার চিত্তে কোথাও একটুকুও চাঞ্চল্য জাগেনা। উদাসীন নির্মম এক শহর।

চাঞ্চল্য জাগে পরদিন সকালেই। ক্রমশই খবরটা ছড়িয়ে যায়।

কাজের মেয়েটা এসেছে ইরার ফ্ল্যাটে। সকালে সে আসে, দিনভোর থাকে, কাজকর্ম করে সন্ধ্যার ট্রেনে সে বজবজের দিকে কোন গ্রামে ফিরে যায়। আসে আবার সকালে।

আজও এসেছে কাজের মেয়েটা রোজকার মত কাজ করতে।

দরজার বেলটা বাজাচ্ছে, বাজাচ্ছে তো বাজাচ্ছেই। অন্যদিন দু' একবার বেল বাজাতেই দিদিমণি উঠে দরজা খুলে দেয়। আজ মেয়েটা বেল বাজিয়েই চলেছে, কোন সাড়া নেই। অথচ ভিতর থেকে কলের জল পড়ার শব্দ উঠছে, আরও দেখা যায়, জলটা বোধহয় অনেকক্ষণ ধরেই পড়ছে, কারণ বাথটাব ছাপিয়ে জল বাথরুম থেকে মেঝে গড়িয়ে এসেছে বাইরের দরজার কাছে। সেখান থেকে বের হয়ে এসেছে সিঁড়িতে।

ব্যাপার দেখে মেয়েটা পাশের ফ্ল্যাটের বুড়ি মাসীমাকেও ডাকে, দু'চারজন অনেকেই জুটে যায়, বাড়ির কেয়ারটেকারও এসে পড়ে। তবুও সাড়া মেলে না ভিতর থেকে। এরপর বিভিন্ন ফ্ল্যাটের দু' চারজন বাসিন্দারাও এসে পড়ে। হাঁক ডাক চলছে। এদের দু'চার জন লাথি মেরে এই বন্ধ ফ্ল্যাটের দরজটা ভেঙ্গে ফেলে ভিতরে ঢুকে শোবার ঘর শূন্য দেখে চাইল। বাথরুম থেকে জল বের হয়ে আসছে, দরজাটা খোলা ভিতরে ঢুকেই অবাক হয় ওরা। টাবে ভাসছে ইরার অর্দ্ধনগ্ন সুন্দর প্রাণহীন দেহটা।

চমকে ওঠে বুড়ি মাসীমা, একি!

কেয়ারটেকার ভদ্রলোকও গিয়ে পুলিশে ফোন করে।

থানায় ফোনটা পেয়ে থানার অফিসার অনুপ ঘোষ একটু নড়ে চড়ে বসে তরুণ এ. এস. আই রতন সেনকে বলে—নাও, আবার ঝামেলা। উঃ একদিনও যদি শান্তি দেয়।

রতন শুধোয়—কি হলো স্যার?

অনুপ বলে—রহস্য! সরেজমিনেই দেখে আসি। উঃ ভাবছিলাম সকাল সকাল বাড়ি ফিরবো রাত ডিউটির পর। দুপুরে খেয়ে দেয়ে একটু নিদ্রা দেব। হয়ে গেল দফা শেষ। চলো—আর কেশব আছে ডিউটিতে? তাকে ডাকো থাকলে।

কেশব তরুণ সি. আই. ডি'র কর্মী, বেশ পেটানো স্বাস্থ্য, এখনও ব্যায়াম করে। বলে রতন—সে তো সকালে বজরঙ্গবলী ক্লাবে ব্যায়াম করতে গেছে স্যার।

অনুপবাবু অফিসার অন ডিউটিকে বলে.

—ওটা এলে একবার লেক রোডে পাঠিয়ে দিও। ক্যামেরা ম্যানকেও ফোন করে দাও।

অনুপ ঘোষ বেশ নামকরা পুলিশ কর্মচারী। কলকাতা পুলিশে ওর সুনাম আছে। প্রায় কুড়ি বৎসরের চাকরী জীবনে বেশ কয়েকটা জটিল হত্যার কেসে তদন্ত করে আসামীদের ধরেছে. সেবার বড়বাজার মার্ডার কেসের আসামীকে বোম্বাই অবধি ট্রাক করে তাকে ধরে আনেন। আর এমনিতেই বেশ হাসিখুশী সজ্জন ব্যক্তি। কিন্তু কাজের সময় তার অন্যমূর্তি, তার সন্ধানী চোখের দৃষ্টিতে কোন কিছুই এড়িয়ে যায় না। এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর বিচারবুদ্ধি দিয়ে হত্যার কারণ গুলোকে বিশ্লেষণ করতে পারেন সহজেই।

লেক রোডের ফ্ল্যাটে পৌঁছে ফ্ল্যাটটা আর এঘরের বিছানাপত্র-দেখতে থাকে অনুপ ঘোষ। সারা ফ্ল্যাটটা ছিমছাম করে সাজানো।

শুধোয় অনুপ ঘোষ উপস্থিত যারা ছিল তাদের—ডেডবডিটা বাথটাব থেকে কে তুলেছেন?

বুড়ি মাসীমা আমতা আমতা করে বলে—বাবা আমিই ওদের দিয়ে তুলেছিলাম। ভাবছিলাম যদি বেঁচে যায়।

অনুপ ঘোষ বলে—ঠিক করেন নি।

দেখতে থাকে বিছানাটা। সেখানে ধস্তাধস্তির চিহ্ন কিছু রয়েছে।

রতন সেন বলে—বিছানা থেকেই তুলে নিয়ে গেছল ওখানে।

ততক্ষণে পুলিশ ডাক্তারও এসেছেন। সুন্দরী প্রাণহীন মেয়েটিকে দেখছেন তিনি।

বলেন—ওকে ক্লোরোফর্ম দেওয়া হয়েছিল জোর করে, তাতেই অজ্ঞান হয়ে যায়। তারপর বাথটাবে ফেলা হয়েছিল।

মেঝেতে কোথাও তেমন পায়ের দাগ পাওয়া যায়না, সব জলে ধুয়ে গেছে, বিছানার উপর বালিশে দু' একগাছি চুলও দেখা যায়। অনুপ ঘোষ সেগুলো তুলে রুমালে জড়িয়ে নেয়। অবাক হয় রতন —স্যার, ওর গলার হারটাও নেয় নি তারা। বেশ দামী হার বলেই মনে হয়।

অনুপ ঘোষ বলে—ওটাও একজিবিট হিসাবে রাখো।

হারটা দেখতে থাকে সে। বেশ ওজনের বাহারি সাবেক কালের হার। মিনা করে লেখা আছে 'আই'। পিছনে ক্ষীণ কি একটা অক্ষর দেখা যায় অস্পষ্টভাবে। মেয়েটির নাম ইরা—সুতরাং ওরই হার বোধ হয়।

ডাক্তারের কথায় শুধোয় অনুপবাবু—ক্লোরোফর্ম দেওয়া হয়েছিল কিসে বুঝলেন ?

ডাক্তার বলেন—ওর নরম ঠোঁট, নাকের নীচে, পোড়ার দাগ রয়েছে। আর তুলোতে কিছু সামান্য গন্ধও রয়ে গেছে।

পুলিশ সেটাও তুলে নিল। ততক্ষণে ফটোগ্রাফারও এসে গেছে, এসেছে সি. আই. ডি'র কেশবলালও। ফটোও তোলা হ'ল বেশ কিছু।

ওদিকে এখান ওখান খুঁজছে পুলিশ ইরার যদি কোন ডাইরী চিঠিপত্র কাগজপত্র পায় তারই আশায়। রতন সেন ওদিকের কাপবোর্ডে একটা সিল্কের পায়জামা আর কাজকরা পাঞ্জাবী দেখে বলে—স্যার, মেয়ের ফ্ল্যাটে পুরুষের পোষাক দেখছি।

অনুপ ঘোষ পায়জামা-পাঞ্জাবী দুটো নিয়েছে, যদি কোন চিহ্ন মেলে। পায়জামা-পাঞ্জাবী কার এ খবর বের করতে পারলেও রহস্য

ভেদ করা সহজ হতে পারে। পায়জামা-পাঞ্জাবী ছুটো একটা প্যাকেটে পোরা। প্যাকেটটা আসানসোলের কোন দোকানের। উড পেন্সিলের একটা নামও লেখা আছে। ভরত মিত্র।

ব্যাস আর কিছু তেমন নেই। খুনীরা কোন চিহ্নই রেখে যায় নি।

ওদিকে খুনের খবরটা ততক্ষণ বিরাট সাততলা বাড়ির বিভিন্ন ফ্ল্যাটে ছড়িয়ে পড়েছে। সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোকই এখানে বাসা বেঁধেছে। তবে কেউ কারো তেমন খবরও বিশেষ রাখেনা। যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত।

অনুপ ঘোষ ততক্ষণে বাড়ির কাজের মেয়েটাকে জেরা শুরু করেছে —কে কে আসতো এখানে? চিনিস তাদেব? তাদের নাম কি জানিস?

মেয়েটা বলে—আমি দিনেরবেলায় থেকে সন্ধ্যার মুখেই চলে যেতাম। দিদিও কাজে বের হতো। তবু দেখেছি মাঝে মাঝে প্রশান্তবাবু আসতেন। আরও ঘরে কাজ করতে আসতো অনেক দিদিমণি। তাদের নাম জানিনা। ওঁরা হৈ চৈ করতেন—চা খাবার খেতেন। প্রশান্তবাবুও আসতেন তখন একবার। তিনি ছাড়া আর কাউকে চিনিনা। রতন শুধায়—প্রশান্তবাবু। —কোথায় থাকেন তিনি? বলো! চুপ করে রইলে যে।

মেয়েটার ছু'চোখে জল নামে ভয়ে। তাছাড়া এখানে ভালোই ছিল সে। ভালো খেতে পরতে পেতো, মাইনেও পেত ভালোই। বাঁচার নির্ভর পেয়েছিল সে। সেটাও হারিয়ে গেল। আর চোখের সামনে ওই মৃত্যুকে দেখে ও ঘাবড়ে গেছে, তারপর পুলিশের দাবড়ানিতে ঘাবড়ে গিয়ে কেঁদে ফেলে সে।

অনুপ ঘোষ বলে—থামো রতন। ওকে ধমকিয়ো না! এ্যাই বল, কোন ভয় নাই তোর। প্রশান্তবাবু কোথায় থাকেন?

মেয়েটা বলল—নিভাদি জানে। নিভাদির সঙ্গে ওর নাকি বিয়ে হবে।

—নিভাদি কোথায় থাকেন ?

এবার জবাব দেয় কেয়ারটেকার। ও নিভাকে চেনে। বলে সে।
—ওর নামেই এই ফ্ল্যাট। আগে উনিই থাকতেন, তারপর ওর বান্ধবী ইরাকে এখানে থাকতে দিয়ে ও ওর নিজের বাড়ি রাসবিহারী এভিনিউ-এ থাকে।

—ওর ঠিকানা জানেন ?

অনুপের প্রশ্নে কেয়ারটেকার ফোন নাম্বারও দেয় তাকে। অনুপের মনে হয় নিভা প্রশান্তবাবু নামের ভদ্রলোককেও পাওয়া যাবে। কিন্তু ভরতবাবুর পাত্তা চাই। তাই শুধোয়, কেয়ারটেকারকে অনুপবাবু।

—ভরতবাবু বলে কেউ কি আসতেন এখানে !

কেয়ারটেকার বলে—আজ্ঞে আরও দু'একজন ভদ্রলোককে দু' একবার আসতে দেখেছিলাম। রাতের বেলায় আসতেন—কাছ থেকে দেখিনি অল্প দাঁড়ি, চোখে গগলস্—সুটপরা বেঁটে খাটো একজন এ ছাড়া আর বিশেষ কাউকে দেখিনি সময় অসময় আসতে।

প্রাথমিক তদন্তে তেমন কোন আশাপ্রদ খবর পাওয়া গেল না। অনুপবাবু বলেন—ডেডবডি পোষ্টমর্টেমে পাঠাও। আর ফ্ল্যাটটা তালাবন্ধ করে বাইরে একজন সেন্ট্রি ও পোষ্ট করো। যদি কেউ আসে খোঁজ খবর নেবে তার। দরকার হয় থানায় ফোন করবে।

সকালে এই বড় বাড়িটায় ঢুকেছিল অনুপ ঘোষ দলবল নিয়ে। খুনের কেস। তার নানা পালা—ফর্ম্যালিটি চুকিয়ে প্রাথমিক তদন্ত সারতে সারতে বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে।

সকালের সোনা রোদ এখন দুপুরের অভ্ররোদে পরিণত হয়েছে। ওরা বের হয়ে এলো।

সকালের সেই কলকাতার রূপ এখন বদলে গেছে। বিচিত্র এই নগরী। এর রূপও বহুরূপীর মত ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। এখন এ

কিশোরী, কখন হয়ে ওঠে যৌবনবতী এক কুহকিনী, দুপুরে তার যৌবন হারিয়ে যেন ক্লান্ত এক রমণীতে পরিণত হয়।

বেশবাস, তার গতি ও তখন ঢিলে ঢালা।

অফিস যাত্রীদের ভিড় নেই, স্কুলের ছেলেমেয়েদের কলরবও প্রায় স্তব্ধ। এক ক্লান্ত রমণী, যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন—।

নিজের নিয়েই ও ব্যস্ত।

ওর জীবন থেকে একটি তরুণী মেয়ে চলে গেল চিরদিনের জন্য নিষ্ঠুরতার শিকার হয়ে, এর জন্য ওর জীবনের গতি কোথাও থামেনি। কোথাও এতটুকু দুঃখ বেদনার আভাস ও নেই। একজন নীরবে হারিয়ে গেল, খসে গেল তার জীবন থেকে জীর্ণ পাতার মত। বনস্পতি যেমন ঝরাপাতার হিসাব রাখে না, এ বিচিত্র শহর কলকাতার তাই—সে নির্বিকার, উদাস।

অনুপ ঘোষরা বাড়ির নীচে এসে গাড়িতে উঠতে যাবে হঠাৎ একজন বিটের কনেষ্টবলের ডাকে চাইল। ওর থানারই পুলিশ—লেকের ওদিকে ডিউটিতে ছিল।

অনুপ শুধোয়—কি ব্যাপার রূপসিং।

রূপসিং বলে—ওদিকে লেকের জলে একটা ডেডবডি পাওয়া গেছে স্যার। জোয়ান—

অনুপ ঘোষ চাইল। ভেবেছিল এখানের প্রাথমিক তদন্ত শেষ করেছে, এরপর বাড়ি গিয়ে স্নান খাওয়া করে একটু জিরিয়ে নিয়ে বৈকালে আবার অফিসে এসে কেসটা নিয়ে তদন্ত শুরু করবে। কিন্তু এই সময় আবার আর একটা ডেডবডির খবর পেয়ে অনুপ ঘোষ বেশ বিব্রত বোধ করে। শুধোয় সে—জলে ডুবে মরেছে বোধ হয়! সাঁতার জানেনা লেকে স্নান করতে আসবে।

রূপসিং বলে—না স্যার। খুন! মানুষ খুন হয়েছে।

রতন বলে, ওঠে—আবার খুন! জোড়া খুন!

অনুপ ঘোষ এর মনে হয় এর সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই তো।

রূপসিং বলে—হ্যা স্যার মারা হয়েছে জরুর।

অনুপ ঘোষ শুধোয়—কি দেখে বুঝলে মারা হয়েছে তাকে ?

—দেখেই মালুম পাবেন স্যার মুর্দাকে !

অনুপবাবু বলে, বিরক্তি ভরা সুরে।

—মরতে আর জায়গা পেল না ? ডুববি তো এই লেক ছাড়া আর জায়গা নাই ? গঙ্গায় গে ডুবতে পারিস না ব্যাটারা, উদ্ধার হয়ে যেতিস।

কনেস্টবল বলে—সুইসাইড কেস না স্যার। মাথার পিছনে গভীর ক্ষতও রয়েছে। মনে হয় খুন করা হয়েছে তাকে। এরপর জলে ফেলা হয়েছে।

রতন সেন বলে—কোথায় ?

কনেস্টবল দূরে লেকের ছায়াছায়া গাছের নীচে লোকজনদের ভিড়টা দেখিয়ে বলে— ওইখানে। ওরা এগিয়ে যায়।

সকাল থেকেই ভ্রমণকারীদের ভিড় করার পর আশপাশের কলোনীর ছেলেরা দল বেঁধে স্নান করতে নামে লেকের জলে। দাপাদাপি করে, সাঁতার কাটে। তাদেরই কয়েকজন ওদিকে সাঁতার কাটতে নেমেছিল। তাদেরই পায়ে ঠেকে ওই মৃতদেহটা। প্রথমে ভেবেছিল অন্য কিছু। তারপর ব্যাপারটা দেখে মৃতদেহটাকে ওরা ডাঙ্গায় টেনে আনে—এক দৌড়ে গিয়ে খবর দেয় ডিউটিরত ওই কনেস্টবলকে। সে বেচারাও ব্যাপার দেখে তার অফিসারকে খবর দিয়েছে। লেকের ছায়াঘন তীরে। অনুপ ঘোষ—রতন সেনরা এসে পড়েছে।

ঠিক চিনতে পারেনা ওই মৃতলোকটাকে। ওর নাম পরিচয়ও জানার কোন উপায় নেই। লোকটার পরনে হাফপ্যাণ্ট একটা বাজারের সস্তা কালচে রং-এর হাফসার্ট, ডাইং ক্লিনিং-এর মুখও দেখেনি সেগুলো জীবনে। লোকটার চেহারা বা স্ট্যাটাস তেমন কিছুই নয়

বলেই মনে হয়। মাথার দিকের খুলিতে গভীর আঘাতের চিহ্ন ওতেই মারা গেছে বলে মনে হয়।

অনুপ ঘোষ বলেন—এ ব্যাটার কয়েকটা ছবি নিয়ে এটাকেও পোষ্টমর্টেমে পাঠাও। ব্যাটাকে মনে হয় দলের কোন লোকই শেষ করেছে রাতের বেলায়।

কাজ শেষ করে ফিরতে বৈকাল হয়ে যায় অনুপবাবুর। সারাটা দিন-কেটেছে ঝড়ের মত। কেশব পাল এর মধ্যে ফটোগুলো ডেভেলাপ করাচ্ছে। পাঠানো হবে ক্রিমিন্যাল রেকর্ড সেকশনে, যদি লেকের জলের ডুবন্ত লোকটার কোন হদিস মেলে।

ক্লান্ত অনুপবাবু বলে—এবার বাসায় যাচ্ছি, যদি কেউ আসে ওই ফ্ল্যাটের খুনের ব্যপারে খবর দিও। আর তার নাম ধাম সব জেনে নেবে।

রতন সেন বলে—একই রাতে দুটো খুন হলো, দুটোর মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই তো ?

অনুপ কি ভাবছে। সেও অঙ্ক মিলাবার চেষ্টা করে কিন্তু তেমন কোন জোরালো যুক্তি প্রমাণ এই দুটো ঘটনার মধ্যে বের করতে পারে না।

অনুপ ঘোষ বলে—কলকাতা শহরে এই রাতে এদিক ওদিকে আরও খুন খারাপি নিশ্চয়ই হয়েছে। তাহলে তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ আছে এর বলতে পারো ?

রতন চুপ করে গেল। বলে অনুপবাবু।

- এই ইরার মার্ডার কেসটা নিয়েই বেশা লেখালেখি হবে, ফ্ল্যাটের লোকেরাও চাইবে এর কিনারা হোক। এই কেসের তদন্তই করতে হবে গভীর ভাবে। এই লেকের জলে চুল্লঠেক টার নাহয় স্মাগলার টার খুনের তদন্তও চলবে আলাদাভাবে। মনে হয়, দুটো বিভিন্ন কারণেই খুন হয়েছে। দুটোর কার্য কারণ আলাদা বলেই মনে হচ্ছে।

অনুপবাবুর স্ত্রী মায়া সকালবেলাতেই স্বামীকে ফিরতে না দেখে থানায় ফোন করে জেনেছিল কোথায় কোন খুনের তদন্তে গেছে। লোকটা দিনভোর ফেরেনি। মায়ার সংসার বলতে একটি মেয়ে, মেয়েটি খুবই চঞ্চল। তাকে নিয়ে দিন কাটে তার।

মেয়েকে স্কুলে দিয়ে এসে মায়া একা থাকে বাড়ীতে। তার সংসারকে সে মনের মত করে সাজিয়েছে। স্নান সেরে পূজোও করে মায়া। সেইই বলে স্বামীকে—আমাদের সংসারে এই নিয়েই থাকবো আমরা। বেশী পয়সার দরকার নেই।

অনুপ ঘোষও রসিকতা করে—চাইলেই বা বেশী পয়সা দেবে কে? সরকার তো রোজ রোজ মাইনে বাড়াবে না। সুতরাং এই নিয়েই খুশী থাকতে হবে।

মায়া বলে—তার দরকার নেই বাপু! এই বেশ আছি।

মায়া পয়সা চায় না, তার সংসারে শান্তি চায়। কিন্তু পুলিশের এই অনিশ্চিত ডিউটির ব্যাপারটা সে মেনে নিতে পারেনা। আজ সারাদিন বসে আছে, মেয়ে স্কুল থেকে ফিরে শুধোয়—মা, বাবা ফেরেনি।

মায়া বলে—রাজকার্য করতে গেছে কিনা!

এমন সময় বাবাকে মটরবাইক ঠেলে ঢুকতে দেখে চাইল মায়া। ওর মনের রাগও মুছে গেছে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত স্বামীকে বাড়ি ফিরতে দেখে। মায়া এগিয়ে এসে বলে,

—স্নান করে নাও, তোমার খাবার গরম করছি।

অনুপবাবু খেতে বসেছে। মেয়ে শুধোয়।

—কোথায় খুন হয়েছে বাবা?

মায়াই বাবার চাকরীর ওই সব ব্যাপার নিয়ে বাড়িতে কোন আলোচনাই করতে চায় না। তাই বলে সে মেয়েকে,

—ওসব খবরে তোমার কি দরকার বুলু? যাও, পড়তে বসোগে।

বুলু মুখ ভার করে চলে গেল ওঘরে। ওকে যেন মা বাবা কিছু বলতে দিতে চায়না।

বলে মায়া—আজকাল ছেলে মেয়েরা ওইসব ক্রাইম ম্যাগাজিন, তদন্ত ম্যাগাজিন পড়ে একেবারে তৈরী। চারিদিকে খুন খারাপিই চলছে।

অনুপবাবু বলে—সমাজের অবস্থাতো এই। যত সমাজবিরোধী কাজ হবে আর তারপর এইসব ঘটবে। সমাজের চেহারাই বদলে যাচ্ছে মায়া।

হঠাৎ ফোনটা বেজে ওঠে।

ফোনটা তোলে অনুপবাবু—কে! রতন! থানা থেকে বলছো?

এদিক থেকে রতন সেনই ফোন করছে। অনুপবাবুর মাথাতে তখন তদন্তের প্যাঁচ শুরু হয়েছে। এসব চলবেই যতদিন না খুনের কোন কিনারা হয় ততদিন অবধি।

তাই রতনের কথা শুনে বলে—ওদের বসিয়ে রাখো, আমি আসছি।

অনুপ উঠে পড়ে টেবিলের উপর ফোন রেখে।

মায়া শুধায়—কি হলো? আবার চল্লে যে, এইতো ফিরলে!

অনুপবাবু জামাটা গলাতে গলাতে বলে,

—থানা থেকে ঘুরে আসছি। দেরী হবে না। একটু জরুরী কাজ আছে।

পুলিশের এই সংলাপ মায়া শুনতে অভ্যস্ত। ভালো লাগেনা তার।

তাই বিরক্তি ভরে বলে—দিনরাতই তোমাদের কাজ। বাড়ি আসা কেন?

অনুপবাবু বলে—তাই-ই মায়া। লোকে যখন ঘুমোয় তখন আমাদের চোখে ঘুম থাকে না। কি করবো বলো—এই চাকরীই তো মেনে নিয়েছি। এইভাবে চলতে হবে।

বের হয়ে গেল অনুপবাবু মটরবাইক দাবড়ে। চুপ করে থাকে মায়া। মনে মনে রাগও হয় দুঃখও হয়। লোকটা আবার বের হলো, কখন ফিরবে কে জানে।

নিভা খবরটা পেয়েই অবাক হয়। বাড়িতেই ছিল সে। ফোনটা বাজতে—তুলেছে। তার পুরোনো ফ্ল্যাটের কেয়ারটেকার ফোন করছে, সেই খবর দেয় ইরার খুনের কথা।

নিভা ইদানীং নিজের কাজ-এর ব্যাপারে ভারতের বিভিন্ন শহরে ঘুরেছে, ক'দিন বাড়ি এসেও যেতে পারেনি, ইরারও খবর নেওয়া হয়নি। ভাবছিল একটু সময় পেলেই যাবে ওর কাছে।

প্রশান্ত ক'দিন আগে এসেছিল। ব্যবসাপত্র নিয়ে সেও ব্যস্ত। আজ হঠাৎ ইরার ওই সর্বনাশা খবর পেয়ে চমকে ওঠে নিভা—সেকি! কি করে হ'ল ?

কেয়ারটেকার যতটুকু জানে বলে মাত্র। জানায়।

—পুলিশও আপনার খোঁজ নিচ্ছিল। আপনাদের ফোন নম্বর ঠিকানা দিয়েছি

নিভা বলে বেদনার্ত কণ্ঠে—খুন করল কে ?

কেয়ারটেকার তা জানেনা। বলে—তাই ভাবছি! এমন সুন্দর ভালো মেয়েটার কি যে সর্বনাশ হলো।

নিভাও ভাবছে কথাটা ফোন ছেড়ে দিয়ে।

নিভা ইরাকে ভালবাসতো, ওই মফঃস্বল শহরের শান্তির জীবন থেকে ইরাকে কলকাতা মহানগরীতে সেই-ই এনেছিল। আজ মনে হয় নিভার ভুলই করেছিল সে, ইরার মনের অতলে যে এত লোভ, লালসা ছিল সেটা বর্দ্ধমানে ওর সঙ্গে মিশে টের পায়নি, এখানের প্রাচুর্যের সন্ধান পেয়ে ইরা হঠাৎ বদলে গেছিল। শহর কলকাতা ওকে বদলে দিয়েছিল।

নিভার চোখে সেই পরিবর্তনটাও ধরা পড়েছিল, কিন্তু তখন আর করার কিছুই ছিলনা। নিভার কোন কথাই সে শোনেনি, কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে নিজের মতেই এগিয়ে গেছিল ইরা। আর তার জন্যই আজ ওর এই পরিণতি।

তবু নিভার কষ্ট হয় মেয়েটার জন্য।

তাই থানাতেই এসেছে সে সন্ধ্যার দিকে অফিস ফেরত। প্রশান্তকেও ফোন করেছিল। কিন্তু প্রশান্ত কলকাতায় নেই। থাকলে কিছুটা ভরসা পেত নিভা। প্রশান্তের উপর নির্ভর করা চলে। যে কোন পরিস্থিতিকে সে সামলাতে পারে। কিন্তু কাল বৈকালের আগে ফিরছে না সে। তাই নিভা একা এসেছে থানায়। এর আগে থানার ভিতরে আসে নি। বাইরে থেকেই যাতায়াতের পথে বাড়িটাকে দেখেছে।

আজ ভিতরে এসে এখানের রুক্ষ কঠিন পরিবেশ, ওই ধড়াচুড়া পরা লোকদের আনাগোনা দেখে একটু ঘাবড়ে যায় নিভা। তবু গিয়ে ঢুকলো ওপাশের অফিসারের ঘরে।

রতন সেন ছিল ডিউটিতে, সেই-ই শুধোয়—কাকে চাই? নিভা ব্যাপারটা বলতে রতন বলে—বসুন খবর পাঠাচ্ছি। আপনার স্টেটমেণ্ট নিতে হবে।

এরমধ্যেই ফাইল চালু হয়ে গেছে। পাকা খবরও জুটছে। পুলিশ ওয়ারলেসে আসানসোলেও খবর গেছে ওখানের পুলিশের কাছে 'ভরত মিত্র' বলে কাউকে পাওয়া যায় কিনা দেখতে, দোকানের নাম ধামও পাঠানো হয়েছে।

আর ওই জরুরী বেতারবার্তা পেয়ে সেখানের পুলিসও দোকানে গিয়ে হাজির হয়ে রাশিকৃত ক্যাশ মেমোর বই খুঁজছে যদি কোন ভরত মিত্রের সন্ধান মেলে।

অনুপ ঘোষ দেখছে নিভাকে। তখন বৈকাল হয়ে গেছে।

শান্ত নম্র মার্জিত রুচির মেয়েই। কোন বেসরকারী ফার্মে ভালো

চাকরী করে। নিজে থেকেই থানায় এসেছে। ওর পুলিশী চিন্তাধারায় বিচার করে মনে হয় ও এ খুনের সঙ্গে জড়িত বোধহয় নেই। বরং সাহায্যই করতে এসেছে যদি ওর বান্ধবীর খুনের কোন কিনারা হয় তার জন্য। অন্তত নিভাকে দেখে তাই ওর মনে হয়।

অনুপ বলে—আপনি ওকে কত দিন থেকে জানতেন?

অনুপ ঘোষ শুনে যাচ্ছে নিভার কথাগুলো। ওদিকে কেশব বসে নোট নিচ্ছে। অনুপ ঘোষ মাঝে মাঝে দু'একটা প্রশ্ন করে মাত্র,

—ওর বাবার নাম ঠিকানাটা বলুন,

নিভা জানায়। আবার শুরু করে তার কথা। প্রশান্তের কথায় আসতে কি ভাবছে অনুপ ঘোষ। ওই প্রশান্তের নাম কয়েকবার শুনেছে। দেখেনি তাকে,

বলে সে—ওর ঠিকানাটা।

নিভা ওর ঠিকানা, ফোন নাম্বারও জানায়।

এইবার প্রশ্ন করে অনুপবাবু।

—আপনি তো ওই ফ্ল্যাটে আগে থাকতেন। সেখানে আপনিই ইরাকে এনে জায়গা দেন। ভরত মিত্র বলে কাউকে চেনেন? ওখানে আসতেন মাঝে মাঝে?

নিভা কি ভাবতে থাকে। বলে সে,

—না! ভরত মিত্র বলে কাউকে ওখানে দেখিনি। আর তখন সেই সময় ভরত মিত্র বলে কারো সঙ্গে ইরার পরিচয় থাকলে আমি জানতাম। কারণ তখন ওর সব কথাই বলতো আমাকে। এমন কোন লোকের কথাতো বলেনি। পরে পরিচয় হলে জানিনা।

অনুপ ঘোষ বলে—তাহলে ভরত মিত্রকে আপনি চেনেন না, দেখেননি?

—না! পরে ইরার সঙ্গে যোগাযোগ হতো কম। এখন ওখানে যেতে বিশেষ সময় পাইনা।

ওর স্টেটমেন্ট রেকড করা হয়েছে। এবার কেশব বলে নিভাকে।

—এটা পড়ে দেখে একটা সই করে দিন।

নিভা চাইল অনুপ ঘোষের দিকে। অনুপবাবু ব্যাপারটা বুঝে বলেন।

—জাস্ট এ ফর্মালিটি!

নিভা সই করে বলে—দেখুন তদন্ত করে, খুনীকে সাজা দিতেই হবে। একটা মেয়েকে এভাবে খুন করে পার পাবে তারা?

অনুপ ঘোষ বলে—চেষ্টা তো করছিই। আপনাদেরও সহযোগিতার দরকার।

উঠে পড়ে নিভা। অনুপবাবু বলে,

—বাইরে যদি যান—দয়া করে আমাদের একটু জানাবেন।

—মানে? নিভা অস্বস্তিবোধ করে ওই কথায়।

অনুপ ঘোষ ব্যাপারটাকে সহজ করার জন্য বলে,

—ওটা নিয়ে এত ভাবছেন কেন?

নিভা বলে—আমিও কি আপনাদের কাছে দোষী যে নজরবন্দী করে রাখতে চান?

হাসে অনুপ। বুঝেছে সে নিভার মনের অবস্থাটা। বলে—না, না, তদন্তের ব্যাপারে দরকার হলে যাতে আপনার সাহায্য পাই সেইজন্যই বলা।

নিভা বলে—ঠিক আছে। নমস্কার।

বের হয়ে এল সে তার উছল দেহের ছন্দ তুলে।

অনুপ ঘোষ বলে—রতন! তুমি তো ওয়াকিং রেসে একবার ফার্স্ট হয়েছিলে?

রতন বলে—হ্যাঁ স্যার। কেন?

অনুপ—ওই সুন্দরীর পিছনে এবার একটু 'ওয়াক' করো মাঝে মাঝে। অবশ্য লোকসান হবে না, বাঙ্গালী মেয়েদের সৌন্দর্য পিছনের দেহশ্রীতে। তাই দ্যাখো কিছু দিন? নিজে না পারলেও আর

একজনকে লাগাবে, ওর গতিবিধির খবর আমার ঈষৎ প্রয়োজন। বুঝেছ?

রতন সেন ঘাড় নাড়ে। সে বোঝে ইঙ্গিতটা।

অনুপবাবু বলে—দাস এখনও ফিরলো না—

দাস সহকারী ইনস্‌পেক্টার। ও ততক্ষণ পার্কষ্ট্রীট এলাকার কোন ম্যানসনের ছ'তলায় এসে হাজির হয়েছে বিখ্যাত ডাক্তার আলুওয়ালার চেম্বারে।

বিরাট চেম্বার, বাইরে ভিজিটার্সদের বসার ঘর, সোফা কোচ দিয়ে সাজানো। সেন্টার টেবিলে ফুলের ভাস। ছড়ানো আছে দিশী বিদেশী ম্যাগাজিন। রোগীদের ভিড়ও রয়েছে।

এ্যাটেনডিং নার্সকে ডাঃ আলুওয়ালার সঙ্গে দেখা করার কথা বলতে নার্স শুধোয়—এ্যাপয়ন্টমেন্ট করেছেন আগে?

দাস বলে—না! জরুরী দরকার। দেখা করতে হবে এখুনি!

নার্স বলে ওঠে—না। সরি। দেখা হবে না। তিনি খুব বিজি।

দাস এবার তার পকেট থেকে পুলিশের আইডেনটিটি কার্ড বের করে গলা নামিয়ে বলে—ডাঃ আলুওয়ালাকে বলুন জরুরী দরকারে এসেছি। দেখা করতে হবে।

নার্স-এর সুর বদলে যায়। ভিতরে চলে গেল সে। দাস বসবার ঘরের এক কোণে বসে আছে নিরীহ মানুষটির মত।

নার্স এসে তাকে বলে—আসুন।

ডাঃ আলুওয়ালার চেম্বারে আর কেউ নেই। শহরের বিখ্যাত নামী ডাক্তার। ভিজিট তার একশো কুড়ি টাকা। ওর রোগীদেরও সাধনা করে তাঁর দর্শন পেতে হয়। এয়ার কুলারের দাক্ষিণ্যে ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা। বাতাসে মিষ্টি একটা সুবাস লাগে।

ডাঃ আলুওয়ালা দাসের প্রশ্নে চাইলেন, কি ভেবে বলেন তিনি।

—ইরা! ঠিক মনে করতে পারছি না।

দাস এবার তার পকেট থেকে ইরার ড্রয়ারে পাওয়া

প্রেসক্রিপশনটা দেখাতে সেটাকে নিয়ে তারিখ দেখে ডাঃ আলুওয়ালা বলেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ। মেয়েটি এসেছিল একদিন। মনে হয়েছিল হাইপার-টেনশনে ভুগছে। এই প্রেসক্রিপশন করেছিলাম আমিই।

—আর সে আসেনি? দাসের প্রশ্নের জবাবে ডাঃ আলুওয়ালা বলেন,

—না। তাহলে এই প্রেসক্রিপশনেই সেটা লেখা থাকতো! কি ব্যাপার বলুন তো।

দাস বলে—মেয়েটি কাল রাত্রে খুন হয়েছে ওর ফ্ল্যাটে।

—সে কি! আলুওয়ালা চমকে ওঠেন।

দাস দেখছে তাকে।

ডাঃ আলুওয়ালার শান্ত মুখে বেদনার ছাপ ফুটে ওঠে। বলেন তিনি—পুওর গার্ল। কি যে হচ্ছে আজকাল শহরে।

দাস উঠে পড়ে। ডাঃ আলুওয়ালা বয়স্ক ব্যক্তি, মাথায় টাক। চোখেমুখে ভদ্রতার ছাপ। বলেন দাসকে।

—দেখুন যদি খুনীকে বের করতে পারেন। এসবের জন্য কঠিন শাস্তি হওয়া দরকার।

দাস বলে—দেখছি আমরা।

—আমার সাহায্যের দরকার হলে আসবেন। উঃ, কিসব হচ্ছে!

—নমস্কার স্যার।

বের হয়ে এল মিঃ দাস।

অনুপ ঘোষ সব কথা শুনছে দাস-এর কাছে।

বলে—ঠিক আছে। এখন দেখো আসানসোল কোন ক্লু দিতে পারে কিনা ওই ভরত মিত্রের। আর এই ফাঁকে প্রশান্ত বাবুর খবর নাও। ওকেও দরকার আমাদের।

প্রশান্ত রায়চৌধুরী তার ব্যবসাপত্র নিয়ে কলকাতা, শিলিগুড়ি, আসানসোল কখনও বাংলার বাইরেও ছোটাছুটি করে। কলকাতাতেও তার অনেক কাজ। এই কাজের ফাঁকেও প্রশান্ত ভাবে অনেক

পরিকল্পনার কথাও। কলকাতায় ফিরে খবরটা পায় সে। নিভাই ফোন করেছিল। অবাক হয় প্রশান্ত—সেকি! ইরাকে কারা মার্ডার করলো! পুলিশ কিছু খবর পেল তাদের?

নিভার কণ্ঠে আতঙ্কের সুর। বলে সে।

—পুলিশ তদন্ত করছে। আমাকেও ডেকেছিল। তোমাকেও খুঁজছে।

—কি বল্লো, প্রশান্ত শুধোয়।

—ওর সম্বন্ধে যা জানতাম বললাম। তোমাকেও থানায় দেখা করতে বলেছে ফিরে এলেই। কে এক ভরত মিত্রকে খুঁজছে পুলিশ। ওর ঘরে নাকি তার একটা ব্যাগ পাওয়া গেছে তার ভিতরে একটা পায়জামা-পাঞ্জাবীও রয়েছে।

অবাক হয় প্রশান্ত—তাই নাকি।

প্রশান্ত এবার চড়া গলায় বলে—তোমাকে তখনই বলেছিলাম ওসব মেয়েকে এনোনা, কোথায় কি বাধাবে কে জানে? কার সঙ্গে ফেঁসে গিয়ে খুন হলো এখন পুলিশ আমাদের নিয়ে টানাটানি করবে।

নিভাও ঘাবড়ে যায়। বলে—এসব হবে কি করে জানবো। তখন তো ভালো মেয়েই ছিল।

প্রশান্ত বলে—সবাই ভালো। এখন ঠ্যালা সামলাও। যেহেতু তুমিই তাকে জায়গা দিয়েছিলে! যতসব পাজী বদমাইস মেয়েছেলে। এখন হাঙ্গামা তো হবেই!

নিভাও ভাবছে এবার সেই কথাটাই। উপকার করতে চেয়েছিল ইরার, দয়া করে এখানে এনে ওর কাজের ব্যবস্থা, থাকার ব্যবস্থা করেছিল। এখন এভাবে ফেঁসে যাবে তা ভাবেনি। নিভা নিজেকেও অসহায়, বিপন্ন বোধ করে। এখন কি হবে কে জানে। মাকেও সব কথা জানাতে পারেনি সে. প্রশান্তই তার একমাত্র নির্ভর।

বলে নিভা—তোমার ওখানে যাচ্ছি প্রশান্ত, অনেক কথা আছে।

প্রশান্ত বলে—ঠিক আছে। এসো।

নিভা আজ ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেছে প্রশান্তর কাছে। মনে মনে খুশী হয় প্রশান্ত, যে নিভা আজ তাকেই অবলম্বন হিসাবে পেতে চায়। নিভার চোখেমুখে ভয়ের ছায়া।

—কি হবে প্রশান্ত? আমি কিছু ভাবতে পারছি না!

প্রশান্ত নিভাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে।

—এত ভয় পাচ্ছো কেন নিভা? পুলিশ সেই খুনীদের ঠিকই খুঁজে বের করবে দেখে নিও। আমি থানা থেকে ফিরে আসছি।

অনুপ ঘোষ ফাইল নিয়ে পড়ছে নিভার স্টেটমেণ্টটা। একটি মেয়ে কলকাতা মহানগরীতে অনেক আশা নিয়ে এলো, কিন্তু শেষ হয়ে গেল কোন নিষ্ঠুর হাতের আক্রমণে। এর পিছনের রহস্যটা এখনও অতল অন্ধকারেই রয়েছে। আসানসোল পুলিশ জানিয়েছে ওই দোকানের এই মাল নয়। ব্যাগটা ওদেরই, কিন্তু ওরা ষ্টেশনারী জিনিসপত্র বিক্রী করে, জামাকাপড় নয়।

সুতরাং রহস্যটা জানা গেল না। তাই অনুপ ঘোষ জামা-পাঞ্জাবী নিয়ে দাসকে পাঠিয়েছে নিউমার্কেট অঞ্চলের দোকানে খবর নিতে। যদি কেউ কিছু বলতে পারে।

রতন সেন ঢুকেছে পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট নিয়ে। ইরাকে ক্লোরোফর্ম করে গলা টিপে খুন করার পর বাথটাবে ফেলে রেখে গেছে কারা মৃত অবস্থাতেই।

অনুপ ঘোষ বলে—তাতো বুঝলাম।

রতন সেন বলে—কাগজেও খবরটা বের হয়েছে।

দু'খানা সংবাদপত্র দেখায়। তাতে বড় বড় হেডলাইনে বলা হয়েছে ফ্ল্যাটে তরুণী খুনের চাঞ্চল্যকর ঘটনার কথা। বিশদ বর্ণনা দিয়েছে ফ্ল্যাটের, ইরার সৌন্দর্যের। কিছু হতাশাময় কবিত্বও করেছে সেই সাংবাদিক, পরিশেষে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কথাও বেশ কড়া করেই বলেছে। আর কঠিন মন্তব্য কিছু করেছে পুলিশ সম্বন্ধে।

অনুপ ঘোষ বলে—ওদের আর কাজ কি বলো? খাচ্ছে দাচ্ছে মোটা মাইনে নিয়ে সবার উপরে ছড়ি ঘোরাচ্ছে। তদন্ত করা কি ভাতের গ্রাস যে মুখে পুরে দিলেই হয়ে যাবে?

সেই প্রশান্তটাকে পেলে?

হঠাৎ স্লিপটা হাতে পেয়ে চাইল অনুপ ঘোষ। রতন সেন শুধোয়—কে স্যার?

ঢুকছে প্রশান্ত, মাঝারি গড়নের তরুণ বয়সটা একেবারে তারুণ্যের কোঠার শেষের দিকে হলেও এখন বেশ তরতাজাই আছে। পরনে দামী স্যুট, দামী ঘড়ি। টাইপিনটাও সোনারই।

—আসতে পারি স্যার? আমি প্রশান্ত রায়চৌধুরী।

রতন সেন ওদিকে কেশব পালও দেখছে ওকে। অনুপ ঘোষ আপাদমস্তক জরীপ করে বলে—বসুন।

সামনের চেয়ারে বসে প্রশান্ত বলে গড়গড়িয়ে।

—ক'দিন বাইরে গেছলাম ব্যবসার কাজে। ফিরে এসে শুনলাম আমার পরিচিত একটি মেয়ে তার ফ্ল্যাটে মার্ডার হয়েছে। আপনারা আমার খোঁজ করছেন। তাই এলাম।

অনুপ ঘোষ দেখছে ওই চটকদার নটবরমার্কা তরুণটিকে। কথার ফাঁকে এর মধ্যে পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করে ওর দিকে বাড়িয়ে সিগ্রেট অফার করে—নিন স্যার।

অনুপ ঘোষ দেখছে সন্ধানী দৃষ্টিতে ওকে, ওর সিগারেট কেসটাকে। একটু অবাক হয়েছে। সিগ্রেট কেসটা সোনার বলেই মনে হয়। সেই বিস্ময় চেপে অনুপ ঘোষ বলে,

—সরি। আমি সিগ্রেট খাইনা।

প্রশান্ত হতাশ হয়েই নিজেই একটা সিগ্রেট মুখে লাগিয়ে এ পকেট থেকে সিগ্রেট লাইটার বের করে ধরালো সেটা। অনুপ ঘোষ দেখছে লাইটারটাকেও, ওটাও সোনারই।

সিগ্রেট কেস, লাইটার-এর মত অতি সাধারণ তুচ্ছ জিনিস-

গুলোতে যে সোনার মত দামী জিনিষ ব্যবহার করে সে যে খুব সাধারণ ব্যক্তি নয় এটা সেও বুঝেছে।

আর প্রশান্তও লোক চরিয়ে খায়, তার চোখেও এই বিস্ময়টা ধরা পড়ে। প্রশান্ত এবার সিগ্রেটের ধোঁয়া ছেড়ে আরাম করে বসে বলে,

—মেয়েটিকে চিনতাম অল্পসল্প। মানে আমার এক বান্ধবী নিভা রায় তারই বন্ধু। তাই।

অনুপ ঘোষ বলে—ওই মার্ডারের রাত্রে আপনি কোথায় ছিলেন?

বলে প্রশান্ত—বললাম তো, একটু কাজের চাপে, বাইরে যেতে হয়েছিল।

—কোথায় গেছলেন? অনুপ ঘোষ প্রশ্ন করে।

প্রশান্ত দেখছে ওই পুলিশ অফিসারকে। অনুপ ঘোষও ওর মানসিক অবস্থা বুঝে বলে।

—তদন্তের জন্য সেই খবর জানা দরকার।

প্রশান্ত সহজ হবার চেষ্টা করে বলে—নিশ্চয়ই জানবেন সবই জানাবো।

প্রশান্ত একটু হেসে বলে—আমি নলদা রাজ ফ্যামিলির ছেলে। অবশ্য রাজপুত্রদের যুগ আর নেই। তবু ওখানে কিছু বিষয় আশয় আছে। সেই ব্যাপারেই যেতে হয়েছিল। সেইরাতে ওখানেই ছিলাম। আমার সেই গ্রামের এষ্টেটে।

অনুপ ঘোষ কি নোট করছে। রতন সেনও দেখছে ওই রাজপুত্রকে রাজা-রাজড়াদের সে বিশেষ দেখেনি। সেই রহস্যজনক অতীতের প্রতিভূদের একজনকে সে দেখেছে আজ।

—ইরার সঙ্গে আপনার কতদিনের জানাশোনা? অনুপ ঘোষ প্রশ্ন করে।

প্রশান্ত উত্তর দেয়—ধরুন বছর দুয়েক।

অনুপ ঘোষ প্রশ্ন করে—ওর সঙ্গে ভরত মিত্র বলে কাউকে মিশতে দেখেছেন ?

চাইল প্রশান্ত। নামটা যেন তার চেনা।

বলে সে—হ্যাঁ। হ্যাঁ। শুনেছি বটে ওই নামের একজন আসতো। একবার দূর থেকে তাকে দেখেছিলাম। মানে জানেন তো নিভা রায় মানে আমার বান্ধবী চাইত না, ইরার সঙ্গে মেলামেশা করি। জানেনতো মেয়েদের চিরন্তন জেলাসি। তবে দেখেছিলাম একবার ওই ভরত মিত্রকে এক নজর। মনে পড়েছে।

—কেমন দেখতে ? অনুপ ঘোষ জেরা করে কঠিন কণ্ঠে। প্রশান্ত কি মনে করার চেষ্টা করে বলে,

—হ্যাঁ। লম্বা, বেশ ফর্সা আর একরাশ কোঁকড়ানো চুল।

—চশমা ছিল ?

মাথা নাড়ে প্রশান্ত—না। দেখিনি মনে হচ্ছে চশমা।

অনুপ ঘোষ এর আগে বাড়ির কেয়ারটেকারের মুখেও এক ভরত মিত্রের বর্ণনা শুনেছিল সে বেঁটে খাটো। টাকওয়ালা, ফর্সা চোখে চশমা। এ বলে তার সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনেরই।

অনুপ ঘোষ কি ভাবছে। এই লোকটার পোষাক-আশাক, কথাবার্তায় একটা আভিজাত্য ফুঠে উঠেছে। ঠিক বুঝতে পারে না ওকে অনুপ ঘোষ। চেহারাতেও আভিজাত্যের ছোঁয়া। সব কেমন ঘুলিয়ে যাচ্ছে। বলে প্রশান্ত—আর কোন প্রশ্ন আছে ?

অনুপ ঘোষ বলে—এখন না। আপনি যেতে পারেন ?

—ধন্যবাদ। উঠলো প্রশান্ত।

বের হয়ে যেতেই বলে অনুপ ঘোষ—এই রাজপুত্তুরের পেছনে প্লেনড্রেসে তিন সিফট্ নজরদারি করার ব্যবস্থা করো। ওর সব খবর আমি চাইই। এভরি ডিটেল।

রতন বলে—ঠিক আছে স্যার।

আজকের মত কাজের পালা এখানেই শেষ। এবার যেন ছুটি পায় অনুপ ঘোষ।

প্রশান্ত থানা থেকে বের হয়ে বেশ খুশি মনে শিষ দিতে দিতে চলেছে, যেন ইস্কুলের ছুটির পর কোন বাচ্চা খুশি মনে বাড়ি ফিরছে। শিষ্ দিতে দিতে চলেছে প্রশান্ত ওদিকের একটা রেঁস্তোরায় গিয়ে ঢুকলো। বেলা হয়ে গেছে, লাঞ্চ এখানেই করে নেবে।

রেঁস্তোরাটার লাগোয়া বারও আছে। এয়ারকুলার চলছে—ঠাণ্ডা পরিবেশে বসে প্রশান্ত খুশি মনে অর্ডার দেয় বেয়ারাকে।

—জিন উইথ লাইম। কড়া—

অর্থাৎ জিন নিয়েই একটু জিরোবে, লক্ষ্য করে না ওদিকের কোণেও এক ভদ্রলোক এসে বসেছে, ও নজর রাখছে প্রশান্তর দিকে এখানের খদ্দের সেজে।

নিভা অফিসের পর এসে হাজির হয়েছে প্রশান্তর এখানে। মনের মধ্যে তার একটা ভয়ের ছায়াই রয়েছে। তাই সন্ধ্যার পরই প্রশান্তের বাসায় এসেছে।

প্রশান্ত কি সব হিসাবপত্র দেখছিল, নিভাকে আসতে দেখে বলে খুশিভরা স্বরে।

—এসো, এসো নিভা। ব্যাপার কি বলো।

নিভা ওকে হাসিখুশী দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে শুধোয়।

—পুলিশ কি জিজ্ঞাসা করলো তোমাকে?

প্রশান্ত বলে—জাস্ট সাম কোশ্চেনস্। কতদিন থেকে চেনেন—কি করতো ও। এটা সেটা। প্রশান্তর মনে নিশ্চয়তার সুর। নিভা বলে,

—আর ভরত মিত্রের কথাটা শুধালো?

প্রশান্ত বলে—হ্যাঁ! হ্যাঁ—লোকটা কে বলোতো?

নিভা বলে—আমাকে ও বলে নি ওসব কথা ইরা।

প্রশান্ত বলে—পরে নানা কাজে জড়িয়ে পড়েছিল ইরা—তাই

বলেছিলাম ওসব মেয়ের ভার নিওনা। আড়ালে কি করবে, ফাঁসবো আমরা। হয়েছেও তাই।

নিভা বলে—এবার একটা ব্যবস্থা করো প্রশান্ত।

প্রশান্ত চাইল ওর মুখের দিকে। ওর মনে সর্বদাই বহুরকম চিন্তা থাকে, শুধোয় প্রশান্ত—কিসের ব্যবস্থা?

নিভা বলে ওর হাতের দামী আংটিটা দেখিয়ে,

—কেন এটার? এই আংটি পরেই থাকবো? বিয়েটা হবে না কোনদিন। মাও বলে প্রায়।

প্রশান্ত এবার মনের সব জড়তা দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে চকিতের মধ্যে উচ্ছল হয়ে ওঠে। বলে সে নিভাকে কাছে টেনে নিয়ে ওকে সান্ত্বনা দেয় মিষ্টি সুরে।

—এই কথা। বিয়ে হবেই—নিভা, একা তোমারই নয়, এ স্বপ্ন আমারও। আর এই স্বপ্নকে আমিও সার্থক করতে চাই। ভাবছি সামনের আট দশদিনের মধ্যেই বিয়েটা চুকিয়ে ফেলবো।

নিভা খুশি হয়, বলে সে—বিয়ের পর চলো দুজনে কিছুদিন নৈনিতাল-এ ঘুরে আসবো। এখানের এইসব বাজে ঝামেলা আমাকে বড়ই অস্থির করে তুলেছে প্রশান্ত।

প্রশান্ত নিভার নরম দেহের উষ্ণ সান্নিধ্যটুকুকে আজ সারা মন দিয়ে পেতে চায়। এ তার অনেক দিনের স্বপ্ন। ঘরই বাঁধবে সে। নিভা অসহায় কণ্ঠে বলে—একটা কিছু করো প্রশান্ত, একা একা এবার এখানে হাঁপিয়ে উঠেছি এইসব ঝুট ঝামেলায়।

প্রশান্তও সায় দেয়—তাই যাবো। ক'দিনে আমিও কাজকর্ম একটু সামলে নিই। নিভা এতদিন পর নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছে। তার নারীমন এবার ঘর বাধতে চায় একান্ত ভাবে।

অনুপ ঘোষ থানায় বসে আকাশ পাতাল ভাবছে।

সেই খুনের কেসের ক'দিনই হয়ে গেল, কোন সূত্রই তেমন বের

হয়নি। অন্ধকারেই হাতড়ে চলেছে। নিভার স্টেটমেণ্টেও কোন ফাঁক নেই, কেয়ারটেকার, কাজের সেই মেয়েটাকেও ত্ব'একবার জেরা করেও কিছু বের হয়নি।

ওদিকে ভরত মিত্রের ব্যাপারটা অন্ধকারেই রয়ে গেছে। দাস সেই পাঞ্জাবী-পায়জামা নিয়ে সারা চৌরঙ্গীপাড়া চষেছে, কেউ কিছু বলতে পারেনি। এবার পাঠিয়েছে গড়িয়াহাটের দিকে। এ যেন খড়ের গাদায় সূচ খোঁজার মতই।

রতন ক'দিন নিভার সুন্দর সুঠাম দেহের পিছনে ঘুরেও তেমন কিছু বের করতে পারেনি, শুধু দেখেছে ওই রাজপুত্রের সঙ্গে অর্থাৎ প্রশান্তের সঙ্গে প্রেমটাই জমিয়েছে বেশ জম্পেশ করে। আর প্রশান্তের পিছনে ঘুরেছে, দেখেছে তরুণটি কলকাতার অভিজাত হোটেলে বারে প্রচুর টাকা ওড়ায়। ওর ব্যাঙ্ক ব্যালান্সেরও খোঁজ নিয়েছে গোপনে, তেমন সঞ্চয় কিছুই নাই, অথচ এত খর্চা জোটে তার।

রতন বলে—কালই দেখলাম ক্রাউন বারে বিল মেটালো ছশো টাকা। আর বেয়ারাকে বকশিষ দিল বেশ মোটা টাকাই।

অবাক হয় অনুপ ঘোষ—এতটাকা ওড়ায় কোত্থেকে?

রতন বলে—রাজপুত্র তো, এর এস্টেট থেকেই টাকা আসে বোধহয়।

বেয়ারা এসে মেসেজ খামটা দিয়ে গেল।

অনুপ ঘোষ সেটা পড়ে এগিয়ে দেয় রতনের দিকে। রতন চিঠিখানায় চোখ বুলিয়ে গর্জে ওঠে।

—ব্যাটা মিথ্যাবাদী, চালবাজ—রাজপুত্তুর। শুয়োরের বাচ্চা।

কেশব পাল এসে পড়েছে। সেও নলদা পুলিশের রিপোর্টটা দেখে বলে, রাজপুত্তুর!

—ওটাকেই ধরে এনে আচ্ছাসে আড়ং ধোলাই দিলে সব বের হবে?

অনুপ ঘোষ বলে—ক'বছর পুলিশে কাজ করে ওইটাই শিখেছো দেখছি। এ ব্যাটা নাম্বার ওয়ান ফাটবাজ, একে অন্যভাবে ট্যাকল

করতে হবে। জানতে হবে ওর রোজগারের পথটা কি? আর সেটা করতে হবে গোপনে। প্রশান্তর পিছনে লেগে থাকো।

গজগজ করে কেশব। সে মারকুটে ধরনের ছেলে। নিজেও ভালো বক্সিং লড়ুয়ে। ও মাঝে মাঝে হাতও চালিয়ে দেয় রাগের মাথায়। এখানে সেটা হতে দেবেন না অনুপ ঘোষ। তাই কেশব রেগে বলে—রোজগার। ব্যাটা নির্ঘাৎ চুরি করে, ডাকাত।

অনুপ ঘোষ ধুরন্ধর পুলিশ অফিসার। কোন পথে হঠাৎ তদন্তের কি মোড় নেবে তা সে জানে। হঠাৎ খেয়াল হয় তার।

—সেই মেয়েটার গলায় একটা হার ছিল, আনো তো। আর কেশব, তুমি গাড়ি নিয়ে গিয়ে ওই প্রশান্ত রাজপুত্তুরকে নিয়ে এসো। আর শোনো—রাজপুত্তুরকে বেশ ইজ্জত দিয়েই আনবে। ও যেন এ রিপোর্ট এর কিছু জানতে না পারে।

কেশব শুধোয়—এ্যারেস্ট করে আনবো স্যার?

অনুপবাবু বলে—ওই তোমার দোষ। ধরে আনতে বললে বেঁধে আনো দেখছি। জবাব দেয়—ওকে দরকার জাস্ট ফর সাম ইনফরমেশন। দেখো, ঘাবড়ে দিওনা।

ও চলে যেতে হারটা ম্যাগনিফ্লাইং গ্লাস দিয়ে দেখছে অনুপ ঘোষ। দামী সাবেকী আমলের হার। এটা ইরার গলাতেই ছিল, হত্যাকারীরা এটার দিকে নজর দেয়নি, বোধহয় দেবার জন্য আসে নি। এসেছিল মেয়েটাকে হত্যা করতেই।

হারের পিছনে অস্পষ্ট মিনার দাগ, একটা অক্ষর 'আই' লেখা আছে মাত্র। ইরাও হতে পারে। কিন্তু নতুন গহনা নয়, আজকের দিনে তো সবাই ফং ফঙে গহনা ব্যবহার করে, এটা নয়। বেশ বনেদী আমলের ওজনদার হার।

ঢুকছে প্রশান্ত বেশ হাসিখুশি অবস্থাতেই। জানে সে নিশ্চিন্তই। অনুপ ঘোষ সাদরে অভ্যর্থনা করে।

—আসুন, আসুন, ওরে প্রিন্সের জন্য চা না কফি, ইয়ে এক্সপ্রেসো কফিই আন।

প্রশান্ত বলে—ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? থাক-থাক।

অনুপ ঘোষ বলে--থাকবে কেন.

প্রশান্ত আরাম করে বসে সেই সোনার সিগ্রেট কেস আর সোনার লাইটার বের করে সিগ্রেট ধরায়। দেখছে সেগুলোকে অনুপ ঘোষ, রতন সেন—কেশবও। প্রশান্ত বলে–আমার আবার বেনসন হেজ ছাড়া সিগ্রেটই চলেনা।

রতন বলে–রাজবাড়ির ব্যাপার তো। প্রশান্ত ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে,

—অবশ্য সেটা যে অন্যতম কারণ—তা বুঝি। আমার বাবা মহারাজা বসন্ত প্রতাপ—চোপ! গর্জে ওঠে অনুপ ঘোষ এবার কঠিণ কণ্ঠে, যেন ঘরে একটা বাজ পড়েছে। বলে অনুপবাবু খাস পুলিশী ভাষায় কড়া স্বরে।

—বাপের নাম ভুলিয়ে দেব।

প্রশান্ত হকচকিয়ে ওঠে—মানে। ইয়ে—

অনুপবাবুর এক ধমকে প্রশান্ত ঘাবড়ে গেছে। বলে অনুপবাবু।

—নলদার রাজপুত্র আপনি।

প্রশান্ত তবু নিজেকে ঠিক রাখার চেষ্টা করে। বলে সে—খবর নিতে পারেন।

অনুপ ঘোষ দেখছে ওকে। লোকটা যে ঘাবড়ে গেছে তা বুঝেছে। তবু তাকে প্রতিবাদ করতে দেখে অনুপও রেগে যায়। বলে সে কড়াস্বরে,

—বংশীমুদি, নলদার বংশীমুদিকে চেনো না? প্রশান্ত এবার ঘাবড়ে যায়।

অনুপ ঘোষ গর্জায়—ইয়াকি মেরেছিলে আমার সঙ্গে? ইয়াকি! বংশীমুদির ব্যাটা হলো কিনা রাজপুত্তুর!

প্রশান্তের মুখের হাসিটা মিলিয়ে যায়। ফর্সা মুখটা তামাটে হয়ে ওঠে। অনুপ ঘোষ গর্জাচ্ছে—কেন? ইয়ার্কি মারার জায়গা পাওনি? এ্যাঁ—রাজপুত্রগিরি ছুটিয়ে দেব।

প্রশান্ত বিবর্ণমুখে বলে,

—না, মানে নলদার রাজপুত্রদের সঙ্গে ওঠাবসা করেছি, পড়েছি—তাদের জমিও কিনেছি।

—তাই তুমিও রাজপুত্তুর হয়ে গেলে। অনুপ গাঁক গাঁক করে।

প্রশান্ত বলে—ভুল হয়ে গেছল স্যার।

অনুপ দেখছে প্রশান্তর হাত কাঁপছে কি ভয়ে। কম্পিত হাতে সে এবার টেবিল থেকে সিগ্রেট কেস লাইটারটা তুলে পকেটে পুরে নেয় সাবধানে।

অনুপ ঘোষ এবার ইরার হারটা দেখিয়ে বলে.

—এটা চেনো?

দেখছে ওটা প্রশান্ত, অনুপবাবু এবার আন্দাজেই বলে টোপ ফেলার মত ভঙ্গীতে।

—ইরার ডাইরীতে আছে. এটা তুমি নাকি ওকে দিয়েছিলে জন্মদিনে।

প্রশান্ত হাসবার চেষ্টা করে। হারটা তারই দেওয়া, পুলিশও জেনেছে। তাই বলে সে—ওটা ওর জন্মদিনে প্রেজেন্ট, করেছিলাম।

অনুপবাবু আর কিছু বলে না। চুপচাপ থাকে। তাই প্রশান্ত বলে—আজ তাহলে উঠি স্যার। আর কিছু প্রশ্ন আছে?

অনুপবাবু বলে—ঠিক আছে, যাও। তবে ডাকলেই যেন পাই। আর মিথ্যে ফাটবাজীর কথা বললে সিধে ফাটকেই পুরে দেব। বুঝলে ছোকরা।

প্রশান্ত বের হয়ে যেতে অনুপ ঘোষ বলে,

—রতন, ওর উপর নজর রাখো, আর কেশব এর মধ্যে একবার তুমি গহনা চুরির রিপোর্ট এই বছর খানেকের মধ্যে কি কি হয়েছে

তার লিস্ট—নাম ধাম একটা বানিয়ে ফেল রেকর্ড সেকশনে বসে। মনে হচ্ছে এই দামী হার, ওই সোনার সিগ্রেট কেস, লাইটার এসব ওর নিজের নয়। পরের ধনে পোদ্দারি করেছে। প্রেম করেছে ব্যাটা—

রতন ক'দিন নিভার পিছনে ঘুরেছে, দেখেছে নিভার হাতেও দামী একটা হীরার আংটি, নিভা আর প্রশান্ত যে দু'জনে খুবই ঘনিষ্ঠ তাও বুঝেছে সে।

বলে রতন—ওই নিভা রায়ের সঙ্গেও ব্যাটা চুটিয়ে প্রেম করছে স্যার। মেয়েটার আঙুলেও দামী একটা হীরের আংটি দেখেছি।

অনুপবাবু বলে—তাহলে এই ব্যাটাই সেটা ওকে দিয়েছে আর সেটা ও পেয়েছে অন্যভাবেই। খোঁজো কেশব।

কেশব বলে—তা খুঁজছি স্যার। কিন্তু খুনের তদন্ত করতে গিয়ে যে চুরি ডাকাতির তদন্তেই নামলাম। রং ট্র্যাক হয়ে যাচ্ছে না স্যার?

হাসে অনুপ ঘোষ—দেখা যাক। বলেন,

—যেখানে দেখিবে ছাই

উড়াইয়া দেখ তাই,

পাইলে পাইতে পারো অমূল্য রতন।

কি পাওয়া যায় ত্যাখো না! একটা পথ ধরে তো এগোতে হবে।

কেশব বের হয়ে গেল রেকর্ড ডিপার্টমেণ্টের দিকে। বিরাট একটা ফর্দই হবে, কিন্তু উপায় নেই। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম—করতেই হবে তাকে এসব ফর্দ।

অনুপ ঘোষ উঠবে, হঠাৎ কাকে দেখে চাইল।

এক বুড়িই ঢুকেছে, গালে রুজ, প্রসাধনের উৎকট ব্যাপার; সাদা চুলগুলো কলপ করেছে, এখন লালচে হয়ে গেছে। পরনে

স্লিভলেশ ব্লাউজ, জীর্ণ হাত দেখা যায়। চোখে সুর্মা। পরনে ফিনফিনে আকাশী রং-এর জর্জেট। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগটাও ম্যাচ করানো হয়েছে কানের দুল, গলার হারের পাথরগুলোর সঙ্গে রং মিলিয়ে। অনুপ শুধোয়—কি চাই।

মহিলা বলে—অফিসার। আমাদের বাড়ির ফ্ল্যাটে খুন হয়েছে একটি ইয়ং গার্ল, আমার ভয় হয় তারা ইয়ং গার্লদের খুন করার জন্য ঘুরছে। আমাকেই না খুন করে।

অনুপবাবু বলে—তাতে আপনার কি? আপনি তো আর ইয়ং গার্ল নন।

মহিলা চমকে ওঠে—কি বলছেন! আমার দিকেও অনেকেরই নজর আছে। কত জন এখনও কাছে আসতে চায়—আই মিন প্রেম করতে চায় আমার সঙ্গে—বয় ফ্রেণ্ড হতে চায়। ইস্—জানেন?

অনুপ ঘোষ হাঁ করে দেখছে ওই ধ্বংসস্তূপকে।

মহিলা এবার অনুপবাবুর গায়ের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে মাতাল চাহনি মেলে বলে গদগদ কণ্ঠে।

—আমি দেখতে খারাপ? ষ্টিল ইয়ং চার্মিং লাভলি। নই? মাই ডিয়ার, বলো—

জাঁদরেল পুলিশ অফিসারও এবার ঘাবড়ে গেছে। সরে দাঁড়াবার চেষ্টা করে বলে—নিশ্চয়ই। হাউ সুইট—

বৃদ্ধা মহিলা এবার জাঁদরেল পুলিশ অফিসার অনুপ ঘোষের চিবুক ধরে আলতো ভাবে আদর করে—ইউ আর এ ফাইন ইয়ং ম্যান।

অনুপও বিব্রত বোধ করে। বলে—ঠিক আছে! বসুন—

রতনও ঘাবড়ে গেছে। মহিলা আশ্বস্ত স্বরে বলে—ইউ আর ওয়েলকাম ইন মাই ফ্লাট। ফোর ওয়ান টু। চারশো বারো—একদিন আসুন মাই ডিয়ার।

অনুপবাবু বলে—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাবো।

—ও সিওর। ইউ আর এ নটি বয়।

আবার চিবুক ধরতেই যাবে ওর, সরে গেল অনুপ ঘোষ। অনুপবাবু বলে—আপনি ফ্ল্যাট থেকে বিশেষ বের হবেন না। কোন ভয় নাই। আমাদের লোক প্লেন ড্রেসে থাকবে ওখানে। আপনাকে গার্ড দেবে।

—থ্যাঙ্ক ইউ। তাহলে আসছেন কিন্তু—ইউ নটি বয়। বাই-

কোনরকমে ওকে বিদেয় করে অনুপ ঘোষ অসহায়ের মত চেয়ারে বসে। তার পুলিশী জীবনে এমন সমস্যার মধ্যে পড়েনি এর আগে।

রতন বলে—স্যার, ওর মাথা খারাপ বোধ হয়। ওই মহিলার।

অনুপবাবু বলে—ফের এলে ও আমাদের মাথাই খারাপ করে দেবে। উঃ! আমি বাড়ি যাচ্ছি, বৈকালে দেখা হবে। আর দেখবে ওই সব কেস যেন আর ভিতরে না আসে? বাইরে বলে দেবে ওদের।

কোনমতে বের হয়ে হাঁফ ছাড়ে অনুপ ঘোষ।

অনুপ ঘোষ নিষ্ঠাবান কর্মী। তাই এই হত্যার কেসটার মর্ম উদ্ধার করতে গিয়ে বেশ ধাঁধায় পড়েছে। ভরত মিত্রের কোন পাত্তাই মেলেনি। আসানসোল পুলিশও জবাব দিয়েছে। তাই ভরত মিত্রকে খোঁজার দায়িত্ব পড়েছে অনুপ ঘোষ এর উপরই।

কেশব পাল সেই ডাইং ক্লিনিং এর সন্ধানে এখন নিউমার্কেট পাড়া ছেড়ে এবার দক্ষিণ কলকাতা চষে বেড়াচ্ছে। এখনও কোন হদিস মেলেনি।

আর রতন সেনকে পাঠিয়েছে অনুপ রবারি সেকশনে, চোরাই গহণার কি সব লিষ্ট আছে তার থেকে কপি করতে।

রতন সেনও কেশব পালের মত খড়ের গাদায় সুঁচ খোঁজার পরিশ্রমই করছে।

কলকাতা শহরের বাইরের প্রত্যহের গতানুগতিক জীবনযাত্রা হাসি, কলরব ব্যস্ততা দেখে মনে হবে না তার অন্ধকারের জীবনটা এত বিচিত্র। সারা দেশের লোভী-শয়তানদের দল যেন এখানে এসে বাসা বেঁধেছে।

চুরি—রাহাজানি—ডাকাতি এসব নিত্যকার ঘটনা।

তার মধ্যে যেটুকু পুলিশের নজরে আসে তাও কম নয়।

রতন সেন ওই বিরাট লিষ্ট দেখে বলে।

—একি চোর ডাকাতের শহর?

ওখানের চাজে যিনি ছিলেন তিনি বলেন।

—দেখতেই তো পাচ্ছো।

রতন বলে—এত গহনা চুরি যায়?

—তা যায় বৈকি! রকমারি গহনা, রকমারি চুরি ও হয় তো। রতন সেন একজন টাইপিষ্টকে নিয়ে বসে লিষ্ট বানাচ্ছে দুদিন ধরে। চুরির ঘটনাস্থল, মালিকের নাম—গহনার বিবরণ এসবই লিখে চালাচ্ছে। মাঝে মাঝে বিরক্তি বোধ ও করে সে!

— এত সব গহনার ফর্দ নিয়ে খুনী কেসের কি ছাতা তদন্ত হবে কে জানে!

কিন্তু উপরওয়ালার হুকুম. তাই করে চলেছে লিষ্টটা।

অনুপ ঘোষ এখনও কোন পথই পায়নি এ কেসের।

বাড়িতে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে ফেরে।

মায়া ও স্বামীর পথ চেয়েছিল। দেখছে সে স্বামীকে। হাসি খুশি মানুষটা। যেন কি গভীর ভাবনার অতলে হারিয়ে গেছে। বেশ বুঝেছে মায়া অনুপ সেই খুনের কেস নিয়েই ভাবছে। বলে মায়া —কি গো! খুনীর সন্ধানে বাড়ি ঘরের কথাই ভুলে গেলে নাকি?

অনুপ বলে—সত্যি। এ কেসটা যা ভাবনায় ফেলেছে। কোন পথই পাচ্ছি না।

মায়া ব্যাপারটাকে হাল্‌কা করার জন্য বলে।

—পাবেন মশাই, পথ ঠিক পাবেন। এখন স্নান খাওয়া সেরে একটু রেষ্ট নিন তো!

পুলিশ অফিসারের জীবনে বিশ্রাম কথাটা যেন নেই। অনুপ তাই ভাবে। তবু এত কাজের মধ্যে ও এটুকুও প্রয়োজন।

মেয়েটাও স্কুল থেকে এসেছে।

বাবাকে কাছে পেয়ে রেবা এসে জড়িয়ে ধরে বাবাকে।

—ড্যাডি। আজ আর বের হবে না। বৈকালে বেড়াতে যাবে কিন্তু আমাকে নিয়ে।

হাসে অনুপ—ঠিক আছে মা মণি!

মায়া বলে—রেবা এখন বাবাকে ছাড়। স্নান করতে দে।

অনুপ ঘোষ এর দিনটা ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে বাঁধা।

তাই ঘুমটা ও সহজেই ভেঙ্গে যায়। তখন বৈকালের আলো ম্লান হয়ে আসে। মনে পড়ে অফিসের কথা। রিপোর্টগুলো আসবে আজ। হওতো কিছু খবর পাওয়া যাবে।

উঠে অনুপবাবুকে পোশাক পরতে দেখে মায়া বলে,

—বেরুচ্ছো?

—হ্যা! জরুরী কাজ আছে মায়া।

মায়া খুশি হয় না। বলে—রেবা উঠলে কি বলবো—

অনুপ জানে সংসারের সকলের চাহিদা মেটাবার অবকাশ তার নেই। বলে সে—পরে একদিন নিয়ে বেরুবো ওকে? একটু বলো—

অনুপ বের হয়ে গেল থানার দিকে।

বৈকালে পার্কে ছেলেমেয়েদের কলরব ওঠে। রাস্তায় দেখা যায় ভ্রমণবিলাসীদের—ওরা কেমন শান্তিতে আছে। আর তার জন্য ঘরের শান্তির স্পর্শ ও নেই।

কেসটা কেমন যেন ভাবিয়ে তুলেছে অনুপবাবুকে।

এর মধ্যে রতন সেন এক লম্বা ফর্দ এনেছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে চুরি যাওয়া গহনার ফর্দগুলো দেখছে অনুপ ঘোষ।

রতন সেন বলে—এর থেকে খুনীর কি হদিশ মিলবে জানিনা।

অনুপ বলে—সকলের সম্বন্ধে আর ও কিছু জানা দরকার। হয়তো ভরত মিত্রের খবর ও বের হবে।

চোখ বোলাচ্ছে লিষ্টটার দিকে। লাল পেন্সিল দিয়ে কিসেয় উপর টিক মেরে কি ভাবছে অনুপ ঘোষ। সারা ঘরটা চুপ চাপ! হঠাৎ অনুপ ঘোষ বলে ওঠে।

—রতন, একটু চলো। ঘুরে আসি একটা কাজ সেরে!

রতন কিছু বুঝতে পারে না।

অনুপ ঘোষ বলে—একটা পথ ধরে তো এগোতেই হবে, দেখা যাক। চলো।

রতন ও নীরবে অনুপ ঘোষের সঙ্গে গিয়ে জিপে উঠলো। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে তা জানেনা সে। অনুপ নিজেই জিপ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কলকাতার দক্ষিণের এক সম্ভ্রান্ত এলাকায় এসে ওরা নামল গাড়ি থেকে। সামনে আটতলা একটা নতুন এ্যাপার্টমেণ্ট হাউস। সামনের পার্কিং লনে বেশ কয়েকটা গাড়িও রয়েছে। একপাশে একটু বাগানের আভাস। ওরা গিয়ে লিফ্‌টে উঠে ছ'তলায় নামল।

কলিং বেল টিপতে দরজা খুলে দিল একটি কাজের লোকই। অনুপ শুধোয়।

—মিঃ ব্যানার্জির ফ্ল্যাট?

চাকর ঘাড় নাড়তে বলে অনুপবাবু—ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ছেলেটা ওকে ড্রইং রুমে বসিয়ে ভিতরে চলে গেল। একটু পরেই মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক বের হয়ে আসেন। ওদের দিকে চেয়ে শুধোন।—কি ব্যাপার!

অনুপ ঘোষ রতনের কাছ থেকে লিষ্টটি নিয়ে বলে—আপনার ফ্ল্যাটে কয়েকমাস আগে চুরি হয়েছিল ?

—মিসেস ব্যানার্জিও এসে পড়েন। মাংসল চেহারা, ওর দেহে মেদের প্রাচুর্য জমেছে বিলাস আর প্রাচুর্য থেকেই। ওই চুরিতে তার বেশ কিছু গহনা গেছে। কোথায় নেমন্তন্নে যাবার জন্য ব্যাঙ্কের ভল্ট থেকে বেশ কিছু গহনা আনিয়েছিল, পার্টিতে যাবার সময় সব গহনা পরে যায়নি, বেশকিছু ঘরেই ছিল। সেই সন্ধ্যাতেই কারা এসে ফ্ল্যাট থেকে সে সব গহনা চুরি করে নিয়ে যায়। এখনও কিছুরই হদিস মেলেনি। মিসেস ব্যানার্জী বলেন,

—চুরি হলো, পুলিশও এলো, শুনছি তদন্তই হচ্ছে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। শুধু কৈফিয়ৎই দিচ্ছি আপনাদের। আমরা টায়ার্ড হয়ে পড়েছি।

মিঃ ব্যানার্জি স্ত্রীকে থামিয়ে দিয়ে বলে,

—ওঁরা তো চেষ্টা করছেন সীমা।

সীমা মেদবহুল দেহ নিয়ে বলে—ছাই করছেন। পুলিশ আজকাল কি করে কে জানে ?

অনুপবাবু এবার পকেট থেকে হারটা বের করেছে, হারটা দেখেই মিসেস ব্যানার্জি বলে—এটা তো আমারই হার। পিসীমা বিয়েতে দিয়েছিলেন—সেদিন এটা চুরি হয়েছিল।

মিঃ ব্যানার্জি বলে—চোর ধরা পড়েছে তাহলে ?

অনুপবাবু বলে—পরে জানাবো। শুধু এই খবরটার জন্যে আসতে হলো। পরে সবই জানতে পারবেন। এখন কিছু বলা যাবেনা। থানায় খবর নেবেন !

ওরা নেমে গাড়িতে উঠলো। এবার একটা রহস্য আরও ঘনিয়ে আসছে। রতন বলে—খুনের মামলার তদন্ত ছেড়ে এবার চুরির তদন্ত নিয়ে পড়লাম।

অনুপবাবু বলে—একটা কেসের সমাধান তো হোক। এখন

বোঝা যাচ্ছে ওই প্রশান্ত রায়চৌধুরীর আসল ব্যবসাটা কি ? ও ব্যাটা চোরাই মালের সামালদার। ওর ব্যবস্থাতো আগে করি। তারপর দেখা যাবে কোন পথ বের হয় কিনা।

থানায় পৌঁছতে দেখা যায় কেশব, দাস ওরা সবাই এসেছে। কেশব বলে—আপনার রাজপুত্তুরকে দেখলাম বৌবাজারে এক সোনার দোকানে।

অনুপ হঠাৎ যেন কৌতুহলী হয়ে ওঠে—কি করছিল ? তোমাকে দেখেনি তো ?

কেশব বলে—না, না। আমিতো তখন অন্য বেশে। ব্যাটা ওখানে মাঝে মাঝে যায় মনে হলো।

অনুপ শুধোয়—আজ কেন গেছলে ?

কেশব বলে—ব্যাটা প্রশান্তকে দেখলাম একটা সোনার সিগ্রেট কেস ভালো দামে বিক্রী করতে। হাজার আষ্টেক টাকা প্রায় নিয়ে ব্যাটা ট্যাক্সিতে উঠে গেল। পিছু নিয়ে দেখলাম—ঢুকলো এয়ার লাইনস্ অফিসে।

—তারপর ? অনুপবাবু প্রশ্ন করে।

কেশব বলে—ব্যাটা টিকিট কাটলো ঢাকার—

অনুপবাবুর অঙ্ক ঠিক মিলে যাচ্ছে। বেশ বুঝেছে ওই প্রশান্তও পাকা শয়তানই। ও বুঝে গেছে পুলিশ তার সম্বন্ধে বেশ কিছু খবর পেয়ে গেছে। এবার বিপদে পড়বে সে, তাই ব্যাপার বুঝে এবার এখান থেকে জাল কেটে পালাবার চেষ্টাই করছে। মনে হয় অনুপবাবুর একটাই নয়, একাধিক চুরি, ফ্ল্যাটে ডাকাতির জন্য সে দায়ী।

অনুপবাবু বলে—দাস, তুমি ওই সোনার দোকানে গিয়ে ওই সিগ্রেট কেসটাকে আটকাও, যেন গালিয়ে না ফেলে। আর কেশব দু'জন সেন্ট্রি নিয়ে চলো ওই ব্যাটা প্রশান্তকে এবার ধরতেই হবে। আর অফিসে বলো—বিভিন্ন ফ্ল্যাটে ডাকাতির পুরো লিষ্ট যেন বানিয়ে রাখে।

মনে হচ্ছে প্রশান্তের লোকজন শুধু একই কৌশলে খালি ফ্ল্যাট বেছে বেছেই চুরি করেছে সেখানে। আর লিষ্টে যা দেখছি তাতে মনে হয় সমাজের একটা ধনিক শ্রেণীর ফ্ল্যাটের খবর ওর রাখতো। সেইসব ফ্ল্যাটে সুবিধামত হানা দিয়ে চুরি করতো ওরা।

কেশব বলে—ব্যাটাকে ধরে এনে কষে দাওয়াই দিলেই সব খবর বের হয়ে আসবে স্যার। আর ও ভারটা আমাকে দেবেন।

অনুপবাবু বলেন—পরে ভাবা যাবে। এখন চলো তো। প্রশান্তকে আটকাতেই হবে।

নিভা এবার মনস্থির করেছে, বিয়ে করে ঘর বাঁধবে দু'জনে। প্রশান্ত আর সে। তারা যাবে বাইরে পাহাড় আর পাইন বনের সবুজে। কিছুদিন ওখানে শান্তিতে ঘুরবে।

কাল রাতেও গেছে নিভা ওখানে।

প্রশান্তও খুশী হয়। বলে সে—তাই হবে নিভা। এবার ঘরই বাঁধবো।

নিভা বলে—মা-ও তাই বলে।

হাসে প্রশান্ত—মা ঠিকই বলেন নিভা। আর মায়ের সব কিছুতো তুমিই পাবে।

নিভা বলে—ওসবে লোভ নেই। আমার সব চাওয়া এখানেই এসে থেমেছে প্রশান্ত।

প্রশান্ত ওকে কাছে টেনে নেয়। ওর চাঁপা কলির মত হাতটা নাড়াচাড়া করে সে। ঝিকিমিকি তোলে আলোয়, ওর আঙুলের দামী হীরেটা।

নিভা বলে—কাল অফিসের পর বের হবো, কিছু কেনাকাটা করতে হবে প্রশান্ত।

প্রশান্ত কি ভাবছে।

নিভা বলে—কি ভাবছো ?

নিভা শোনায়—বিয়ের কথা বলে তোমাকে বিপদে ফেলেছি, না ? যদি তোমার আপত্তি থাকে জোর করবো না।

প্রশান্ত হাসে—তেমন কথা কিছু বলেছি নাকি নিভা ? আমিও চাই নিভা ঘর বাঁধতে, সুখী হতে।

নিভা স্বপ্ন দেখে। বলে সে—কাল বৈকালে দেখা হবে। চলি—

নিভা বের হয়ে যায় প্রশান্তের ফ্ল্যাট থেকে।

কথাটা ভেবেছে প্রশান্তও। সবই সহজ সরল পথেই চলেছিল। আমদানীও ভালোই হচ্ছিল, ভাগ্যের চাকাটাও সহজভাবেই চলছিল। আজ প্রশান্ত নিভাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে পারতো, নিভার মায়ের বিষয় আশয়, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স—ভল্টে জমানো গহনাও কম নেই। প্রশান্ত থিতু হতে পারতো।

কিন্তু হঠাৎ হিসেবে গোলমাল হয়ে গেল তার ওই ইরার খুন হবার পরই।

এবার পুলিশও টের পেয়ে গেছে। প্রশান্ত তাই এবার নিজের পথই দেখে নেবে। ওই পুলিশ তার টিকিও ধরতে পারবে না। তার আগেই সে এ দেশ থেকেই বের হয়ে যাবে অন্যত্র।

সুটকেশটা গোছাচ্ছে। সামান্য কিছু নিজের জামাকাপড় পুরছে সুটকেশে, এমন বাইরে সে মাঝে মাঝে যায়, এও তেমনিভাবেই যাবে, পরে লোকে বুঝবে তার অন্তর্ধানের কথা। তখন সে চলে যাবে পুলিশের নাগালের বাইরে।

মেঝেতে উবু হয়ে বসে সুটকেশটা গোছগাছ করছে, হঠাৎ পিছনের বন্ধ দরজায় একটা কিসের শব্দ শুনে মুখ ফেরাতে যাবে, দেখে একটা কালো জামাপরা ছায়া মূর্তি তার ঘাড়েই প্রচণ্ড আঘাত করেছে, সেই আঘাতে সুটকেশের উপর ছিটকে পড়ে প্রশান্ত, লোকটা তার মুখ ঠেসে ধরেছে।

প্রশান্ত অস্ফুট আর্তনাদ করে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে,

ছিটকে পড়ে সশব্দে স্যুটকেশটা, লোকটা তার নাকের উপর ঝাঁঝালো তীব্র গন্ধওয়ালা খানিকটা তুলো ঠেসে ধরতে চায়। প্রাণপণে বাধা দেবার চেষ্টা করে প্রশান্ত, ওর পায়ের ধাক্কায় টিপয়টা উলটে পড়ে, বোতলও একটা ভেঙ্গে যায় সশব্দে।

অনুপ ঘোষ দলবল নিয়ে প্রশান্তর ফ্ল্যাটের সামনে এসে বেলটা বাজাতে থাকে, ভিতরে কি একটা ছিটকে পড়ার শব্দ ওঠে—তারপরই একটা গোঙানির শব্দ ওঠে, ছিটকে পড়ে একটা বোতল চুরমার হবার শব্দ শোনা যায়। একটা সোফা যেন উল্টে পড়েছে। বাইরে পুলিশ, অনুপও উৎকর্ণ হয়ে শুনছে। কি যেন চলেছে ভিতরে।

অনুপ ঘোষ অবাক হয়—কি ব্যাপার! কি হচ্ছে ভিতরে? বেলের আওয়াজ ছাপিয়ে কাঁচ ভাঙ্গার শব্দ ওঠে—গোঙানির শব্দও। দরজা খোলো—

অনুপ ঘোষ আর পুলিশবাহিনী এবার তৈরী হয়।

কেশবও তার বিশাল দেহের প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে ছুটো লাথি মারতে দরজাটা ভেঙ্গে পড়ে। খোলা রিভলবার হাতে ওরা ভিতরে ঢুকে দেখে মেঝেতে স্যুটকেশটা উল্টে পড়ে আছে, ছিটিয়ে আছে জিনিসপত্র, বোতল ভাঙা—তার মাঝে উপুড় হয়ে পড়ে আছে প্রশান্তের জ্ঞানহীন দেহটা।

আর ফ্ল্যাটে এদের ঢুকতে দেখে একটা ছায়ামূর্তি সরে গেল। অনুপ ঘোষ চীৎকার করে—কে যেন গেল ওদিকে। কেশব—

কেশবও এঘর থেকে দৌড়ে যায়। ওদিককার ঘরে, কোথাও কেউ নেই, এখান ওখান খুঁজে কাউকে দেখতে না পেয়ে জানালা দিয়ে বাইরে, এদিক ওদিক চাইতে দেখে নীচে পাইপ বেয়ে কে একজন নামছে তরতরিয়ে বেশ জোরেই।

কেশব উপর থেকেই গুলি করে। অনুপও চীৎকার করে—ওদিকে ওখানে—

লোকটা টিকটিকির মত পাইপ বেয়ে নেমে গেল।

কিন্তু কার্নিশের জন্য গুলিটা পৌঁছেনা, সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে। দু'একজন কনস্টেবলও, ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে নিচে দৌড়ে নামছে সিঁড়ি দিয়ে যদি লোকটাকে পাওয়া যায়।

কিন্তু লোকটা আরও সাবধানী আর এ বিষয়ে পারদর্শীই।

সে নেমে পড়ে অন্ধকারেই তখন দৌড়ে কোন দিকে হারিয়ে গেছে। পুলিশ বাহিনী এদিক ওদিকে দৌড়েও আর তার পাত্তা পায়না, লোকটা ততক্ষণে কর্পূরের মত হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

কেশব গর্জায়—শালা হাতের ফাঁক দিয়ে পিছলে পালালো। ও ব্যাটাকে ধরতে পারলে কাজ হতো।

অনুপ ঘোষও এবার দেখছে। মনে পড়ে তার ও ব্যাপারটা।

বলে সে—তাইতো হে। মেয়েটাকেও এই একইভাবে প্রথমে অজ্ঞান করে তারপর দমবন্ধ করে মেরেছিল, আজও ঠিক সেইভাবেই এটাকেও শেষ করতে গেছল ওরা। 'মোডাস অপারেণ্ডি' অর্থাৎ খুনীদের কাজের পদ্ধতি দেখছি একই রকমের।

রতন বলে—মনে হচ্ছে একটা দলেরই কাজ।

ঘরের এদিক ওদিকে খুঁজছে ওরা। কিন্তু খুনী কোন চিহ্নই রেখে যায়নি। মনে হয়, একাজে তার অভিজ্ঞতাও আছে। অনুপ মেঝেতে পড়ে থাকা প্রশান্তকে দেখে বলে, ব্যাটা রাজপুত্তুর অজ্ঞান হয়ে গেছে, তার বেশী কিছু করতে পারে নি ওরা আমরা এসে পড়ায়। নাহলে এটাকেও শেষ করতো ওরাই. মুখে চোখে জলের ঝাপটা মারো, জ্ঞান ফিরবে।

ওরা তাই করছে।

অনুপ ঘোষ স্যুটকেশের জামা কাপড় দেখছে—ওর মধ্যে থেকে ঢাকার এয়ার টিকিট, পাশপোর্টও বের হয়ে আসে। একটা সোনার লাইটার আর বেশ কিছু টাকাও মেলে। বিদেশের ব্যাঙ্কের একটা পাশবই, সেটা অবশ্য অন্য কোন নামে। কে জানে সেদেশে এ

বোধহয় সেই নামেই পরিচিত। পাশপোর্টে ও দেখা যায় সেই নামই। কিন্তু ছবিটা একই।

চমকে ওঠে অনুপ ঘোষ—ব্যাটা দেখি পাক্কা ক্রিমিন্যাল। জ্ঞান ফিরলো ওটার?

রতন বলে—বোধহয় এবার ফিরবে স্যার। নড়াচড়া করছে।

হঠাৎ ফ্ল্যাটে একটি সুন্দরী আধুনিকা মেয়েকে ঢুকতে দেখে চাইল অনুপবাবু। মেয়েটি তার চেনা। এর আগে সেই ফ্ল্যাটের মেয়েটির খুনের ব্যাপারেও এর স্টেটমেণ্ট রেকর্ড করেছে। হঠাৎ তাঁকে এখানে ঢুকে ব্যাকুল হয়ে প্রশান্তের চেতনাহীন দেহের দিকে ছুটে যেতে দেখে চাইল অনুপ ঘোষ। চিনেছে মেয়েটিকে সে, নিভা।

নিভা ভাবতে পারে না কি হয়েছে।

সে এসেছিল প্রশান্তকে নিয়ে মার্কেটিং-এ যাবে। তাদের বিয়ের জিনিসপত্র কিনতে হবে। কিন্তু প্রশান্তর এই অবস্থা দেখে ব্যাকুল হয়ে ওঠে সে। এদের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে ওর মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে মুখেচোখে জল দিয়ে ব্যাকুলভাবে ডাকে—প্রশান্ত। প্রশান্ত—এ কি হয়েছে তোমার? কারা একাজ করে গেল, প্রশান্ত।

প্রশান্তের জ্ঞান কিছুটা ফিরছে। তখনও ক্লোরোফর্মের ঘোর কাটেনি, তবে জলের ঝাপটায় কাজ হয়েছে, আর সেই ছায়ামূর্তি বেশ জমিয়ে ওই ক্লোরোফর্মটা শোঁকাতে পারেনি, তাই ব্যাপারটা অল্পের উপর দিয়েই গেছে। তবু যা ঘটেছে তাও নেহাৎ কম নয়।

প্রশান্ত কিছুটা সামলে নিয়ে জড়িত কণ্ঠে শুধোয়।

—আমি কোথায়? নিভা! তুমি—

নিভা বলে—এসে দেখলাম তোমার এই অবস্থা। কি হয়েছিল প্রশান্ত? প্রশান্ত শূন্য দৃষ্টিতে পুলিশ অফিসার অনুপবাবুদের দেখছে।

অনুপবাবু শুধোয়—তোমাকেই শেষ করতো আর একটু হলে, লোকটা কে? চেন তাকে? জবাব দাও।

নিভা অবাক হয়—খুন করতে এসেছিল? প্রশান্ত কে!

প্রশান্ত শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এখনও তার ক্লোরোফর্মের পুরো ঘোর কাটেনি। নিভার ব্যাকুল আর্তনাদটা ক্ষীণ শোনায় প্রশান্তের কাছে।

নিভা বুঝেছে প্রশান্ত খুব বরাত জোরে বেঁচে গেছে।

মালপত্র ছত্রাকার করে ছড়ানো। সারা ঘরে ধস্তাধস্তির চিহ্ন। আততায়ীর ও কোন চিহ্ন নেই।

অনুপবাবু বলে—হ্যাঁ। আমরা না এলে শেষই হয়ে যেতো প্রশান্তবাবু।

নিভা অস্ফুট আর্তনাদ করে—তাই নাকি। কারা তারা? কেন মারতে এসেছিল ওকে?

অনুপবাবু বলে—সেই প্রশ্নই তো করছি এই রাজপুত্রকে। জবাব দাও—চিনতে পেরেছো তাদের? কি হে প্রশান্তবাবু, একটু চেয়ে দেখে বলো যা বলার।

প্রশান্ত ব্যাপারটা ভাববার চেষ্টা করছে।

সব চিন্তা ভাবনা তার কেমন ঘুলিয়ে যায়। সব কেমন ঘোলাটে মনে হয়, লোকটাকেও ঠিক দেখার অবকাশ পায়নি সে। ছায়ামূর্তির মত লোকটা তার উপর লাফ দিয়ে পড়ে আঘাত করেছিল ঘাড়ে। আর তেমন কিছু মনে নেই।

তাই অনুপবাবুর প্রশ্নে বলে সে—আমার কিছু মনে নেই স্যার। তাদের একজনকেই দেখেছিলাম একনজর, সেই সময়েই ও ঘাড়ে কিসের আঘাত করে আমাকে অজ্ঞান করে দেয়। আর কিছু মনে নেই, জ্ঞান হতে আপনাদের দেখছি। একটু জল।

নিভাই উঠে গিয়ে খাবার জল এনে ওকে খাইয়ে দেয়। প্রশান্ত উত্তেজনায় ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছে। এবার অনুপবাবু বলে প্রশান্তকে—

—তোমাকে বলা হয়েছিল আমাদের না জানিয়ে কোথাও যাবে না? কিন্তু দেখছি তুমি পালাচ্ছিলে আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে

এদেশ ছেড়ে আজই—এই তোমার টিকিট, পাশপোর্ট—ভিসা। কেন ?

নিভা অবাক হয়। এ যেন নতুন কথা শুনছে সে।

নিভা বলে—সেকি! তুমি চলে যাচ্ছিলে ? আমাকেও কিছু বলনি ?

ঢোঁক গিলে প্রশান্ত বলে—ব্যবসার কাজে হঠাৎ যেতে হচ্ছিল তোমাকে বলার সময় পাইনি নিভা। আজ সকালেই ঠিক হলো কিনা—তাই যেতে হচ্ছিল জরুরী কাজে।

অনুপবাবু বলে—অথচ টিকিট কাটা হয়েছে কালই। ডেটটা গ্যাখো—

নিভা অবাক হয়। বলে অনুপবাবু

—বিদেশের টিকিট—আর এই পাশপোর্ট, অবশ্য অন্য নামে, জাল পাশপোর্ট করে উনি পালাচ্ছিলেন। ব্যবসাও কিসের তাও বুঝেছি এবার প্রশান্তবাবু।

এর মধ্যে রতন দেখেছে ওই নিভার হাতের আংটিটা। ওর নজর পড়েছে দামী হীরার আংটির দিকে, ওদিকে স্যুটকেশে রয়েছে সোনার লাইটারটা।

রতন এর মধ্যে সেই চুরির মালের লিস্ট বের করে শুধোয় প্রশান্তকে—এই সোনার লাইটারটা কি লিস্টে আছে স্যার ? দেখবো ?

প্রশান্ত এর মধ্যে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। ওর প্রশ্নে জানায়, —ওটা কিনেছিলাম।

—কোথা থেকে কিনেছেন ? জেরা করে কেশব বেশ ধমকের সুরে।

প্রশান্ত বলে—এমনি এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে।

রতন এর মধ্যে লিস্ট দেখে বলে—ওটা মিঃ প্যাটেলের লাইটার।

ওর ওল্ড বালিগঞ্জের বাড়ি থেকে চুরি গেছল আজ থেকে সাতমাস আগে। এই তার মিসিং রিপোর্ট।

প্রশান্ত বলে—আমি কিনেছিলাম, যার কাছে কিনেছিলাম সে কি করেছে তা জানি না।

নিভা সব শুনে বলে—তাই হয়েছে। উনি কেন এসব কাজ করতে যাবেন! আপনাদের ভুল ধারণা। এভাবে ওকে মিথ্যে কেসে জড়াতে চাইছেন।

অনুপ ঘোষ বলে—ম্যাডাম, আপনি যে আংটিটা পরে আছেন, ওটা—

নিভা বলে—ওটা উনিই দিয়েছেন, আমরা বিয়ে করছি সামনের সপ্তাহেই।

অনুপবাবু বলে—ওই আংটিটা উনিই দিয়েছেন আপনাকে।

প্রশান্ত বলে—হ্যাঁ।

রতন সেন লিষ্ট দেখে বলে ওঠে

—একটি হীরার আংটি, সোনার ওজন দেড়ভরি কমল হীরা দশ ক্যারেট, চুরি গেছল সানি পার্কের এক ফ্ল্যাট থেকে। মিঃ দত্তরায়ের ফ্ল্যাট থেকে। মনে হচ্ছে স্যার এইটাই—

অনুপ ঘোষ এবার নিজমূর্তি ধরে হুঙ্কার ছাড়ে।

—জবাব দাও প্রশান্ত, এটাও অন্য কোন পথের মানুষের কাছে কিনেছিলে?

প্রশান্তের মুখ এখন বিবর্ণ, তামাটে। তার হাত কাঁপছে। চোখে নীরব ভয়ের কালো ছায়া। নিভা দেখছে ওকে। এবার তারও মনে হয় এতদিন ধরে প্রশান্তকে সে চিনতে পারে নি। ওকে না জেনেই ভালোবেসেছিল, স্বপ্ন দেখেছিল দু'জনে ঘর বাঁধার। এ কোন মানুষ সে।

নিভাই বলে-প্রশান্ত জবাব দাও। জবাব দাও ওদের কথার? এসব সত্যি না মিথ্যে!

প্রশান্ত কি জবাব দেবে জানে না। আজ তার সব কাজের খবরই ওরা টেনে বের করেছে।

অনুপবাবু নিভার সামনে প্রশান্তর জাল পাশপোর্ট টায় লাগানো প্রশান্তর ছবিটা দেখিয়ে বলে,

—দেখুন, ওর কীর্তি দেখুন, আর ঘণ্টা খানেক সময় হাতে পেলে ও এই দেশ থেকেই পালাতো। অবশ্য ওর স্যাঙ্গাতরা যদি না খুন করতো ওকে। কেন খুন করছিল বুঝেছেন?

নিভা এবার রাগে অপমানে জ্বলে ওঠে। তাকেও ঠকিয়েছে প্রশান্ত।

প্রশান্তর গালে একটা সজোরে চড় মেরে গর্জে ওঠে নিভা।

—শয়তান, জালিয়াত তুমি! তোমাকে চিনতে পারিনি, এতদিন ধরে তুমি আমাকেই ঠকিয়েছো। নীচ—ইতর। আজ তোমাকে আমিই শেষ করবো।

কেশব ওকে সরিয়ে নেয়।

অনুপবাবু বলে—আপনারও শিক্ষা হওয়া উচিত ছিল। আজকালকার মেয়েদের কাছে সাবধানতা বলে কিছুই নেই, তাই পদে পদেই ঠকেন আপনারা, ওই শয়তানরা ঠকাতেই থাকে। আর আপনার মত মেয়েরাও ওদের জালে পা দেন অতি সহজেই।

নিভা জবাব দিতে পারেনা। এতদিন ধরে প্রশান্তর সঙ্গে মিশেছে, নিজের অজানতেই ওর মত মানুষের প্রেমে পড়েছে। এ তারই চরম অপমান। এভাবে ঠকেছে সে এতদিন, কি অনুশোচনায় মন ভরে ওঠে!

নিভার চোখে জলের আভা জাগে।

আজ মনে হয় সত্যিই সে ঠকেছে, একটা ভদ্রবেশী শয়তানকে সে ভুল করে ভালোবেসেছিল। সারা শরীর জ্বলে ওঠে, মনে ওঠে ঝড়ের আবেগ। কি দুঃসহ জ্বালায় নিভা সামনে দাঁড়ানো প্রশান্তর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে উন্মাদের মত কিল চড় মারতে থাকে।

কেশব পালই ওকে সরিয়ে দিয়েছে। বলে।

—ওকে মেরে কি হবে ম্যাডাম এইবার ওর ভার আমাদের উপরই ছেড়ে দিন।

অনুপবাবু বলে—প্রশান্ত, তোমাকে এ্যারেস্ট করা হোল।

প্রশান্ত নির্বাক চাহনিতে চেয়ে থাকে। কেশব পাল বলে

—আর ওই আংটিটা?

নিভাই সেটা খুলে ফেলেছে। তার আঙুলে আর ওই শয়তানের বিষাক্ত প্রেমের কোন চিহ্নই সে রাখতে চায় না। নিভা আংটিটা পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে বলে

—এটাও নিয়ে যান ওই শয়তান ইতরের সঙ্গে।

নিভা রাগে অপমানে লজ্জায় বের হয়ে গেল। অনুপবাবু এতক্ষণ ধরে যেন একটা প্রেম বিচ্ছেদের নাটকের নীরব দর্শক হয়েই দাঁড়িয়েছিল। এবার বলে

—নিয়ে চল এটাকে। তারপর দেখা যাক কি করা যায়।

অনুপবাবু ভাবছে কথাটা।

ইরার হত্যার কেস-এর কোন বিশেষ ক্লুই পাওয়া যায়নি আজও অবধি। শুধু সেই কেসের তদন্ত করতে করতে এতদিন ধরে কিছু বিশিষ্ট ধনীদের ফ্ল্যাটে চুরির একটা চক্রকে কিছুটা আবিষ্কার করেছে। এ যেন কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কেঁচোর সন্ধান পায়নি, সাপই বের করেছে।

অনুপবাবু দেখছে প্রশান্তকে। একটি অন্ধকার নাটকের নায়ক মাত্র।

চালবাজ, একটা ছেলে। নটবর সেজে প্রেমও করেছে চুটিয়ে।

শুধোয় অনুপবাবু—প্রশান্ত, ভরত মিত্রকে চেন?

প্রশান্ত চাইল। এই পথ দিয়ে সে মুক্ত মানুষের মতই যাতায়াত

করতো, আজ এই পথে চলেছে বন্দী হয়ে। মুক্তির কোন আশাও তার নেই। চুরির কেসেই জড়িয়েছে তাকে পুলিশ, এতেও খুশী নয়। এবার খুনের কেসেও জড়াতে চায়। প্রশান্ত সাবধানী মানুষ। বলে সে বিপদের গুরুত্ব বুঝে বলে।

—আমাকে মিছে মিছিই জড়াচ্ছেন স্যার। ওসব নামও শুনিনি। ভরত মিত্রকে জানিনা, চিনিনা। বিশ্বাস করুন।

কেশব বলে—কি শ্লা বিশ্বাসের মাল রে! মারবো এ্যাক্ আপার কাট—মেরেই বসবে যেন। আর কেশবের আপার কাট খেলে রোগাপটকা প্রশান্ত কোথায় ছিটকে পড়বে কে জানে। ভয়ে শিউরে ওঠে প্রশান্ত।

অনুপবাবু বাধা দেন—থামো কেশব। ওসব করো না। খোঁজ খবর করো, ভরত মিত্রকেও পাওয়া যাবে। প্রশান্ত অবশ্যই সাহায্য করবে এবার।

রতন বলে—কিন্তু দুটো কেস তো আলাদা। দু'দুটো মার্ডার কেস ঘটে গেল আমাদের এলাকায় প্রায় একই দিনে, একটা ওই ফ্ল্যাটে, আর একটা লেকের জলে। কোনটারই কিনারা হ'লনা। এদিকে চুরি যাওয়া মাল ধরে বেড়াচ্ছি।

অনুপবাবু বলে—মনে হয় দুটো মার্ডারের মধ্যে কোন যোগসূত্র থাকতে পারে আবার নাও পারে। কেশব, যেটা লেকের জলে মারা গেছে তার পাত্তা বের হলো?

কেশব বলে—দু'এক জায়গায় গেছি স্যার, কোন পাত্তা মেলেনি। আর একজনের কাছে যেতে হবে। দেখা যাক সেখানে কোন খবর মেলে কিনা।

অনুপবাবু বলে—তাই যাও। দেখ ওটা কে! কাদের সঙ্গে মিশতো—হয়তো কিছু খবর বের হবে।

কেশবও ভাবছে কথাটা।

ওরা থানার দিকে আসছে গাড়ি নিয়ে।

এক ভদ্রলোক থানাতে এসে এখানের অফিসার ইনচার্জের খবর করে, ডিউটি অফিসার বলেন—তিনি কাজে বের হয়েছেন। একটু দেরী হবে। ভদ্রলোক বলেন—তাহলে একটু অপেক্ষা করি। ওর সঙ্গে দেখা করতেই হবে। বিশেষ দরকার আছে।

ভদ্রলোক মনে হয় বাইরে থেকে এসেছে, হাতে এ্যাটাচি কেস।

অনুপবাবুরা নামছে জিপ থেকে, ওদের সঙ্গে রয়েছে প্রশান্ত। শ্রান্ত পরিশ্রান্ত চেহারা।

ভদ্রলোক এক নজরেই চিনেছে প্রশান্তকে। লোকটাকে আগেও দেখেছে কয়েকবার, তখন পরনে ছিল কেতাদুরস্ত পোষাক, মুখচোখে তাজা টসটসে ভাব, এখন একেবারে ঝোড়ো চেহারা, চুপসে গেছে। তবু ওকে চিনতে ভুল হয়না। ভদ্রলোক-এর রাগটা মাথায় চড়ে যায়। ওই শয়তানই তার সর্বনাশ করেছে।

ভদ্রলোক প্রশান্তকে দেখে একেবারে বাঘের মত লাফ দিয়ে পড়েছে ওর উপর। ভারি এ্যাটাচি কেস দিয়েই ওর মাথায় পিঠে দমাদ্দম ঘা মারতে থাকে।

অতর্কিত আঘাতে প্রশান্ত ছিটকে পড়ে পুলিশের গাড়ির উপরই। পুলিশের হেপাজতে রয়েছে সে এখন, তাকে এভাবে অপরিচিত এক ভদ্রলোকের হাতে প্রহৃত হতে দেখে অনুপবাবু এগিয়ে আসে। ভদ্র-লোক তখন যেন ক্ষেপে উঠেছে। অনুপবাবু বলে—আরে, একি করছেন? ছাড়ুন ওকে।

অনুপবাবু, কেশব এরা এমনি ধরনের প্রচণ্ড আক্রমণের জন্য তৈরী ছিল না, বিশেষ করে থানায়, তাই একটু অমনোযোগীই ছিল তারা। এই অতর্কিত আক্রমণে তারাও এবার ভদ্রলোককে ব্যাগ সমেত ধরে থামিয়ে ধমকে ওঠে

—লোকটাকে মারছেন কেন? কি করেছে ও?

উত্তেজিত ভদ্রলোক বলে—মারবো না? ব্যাটা শয়তানকে মেরে খুন করে দিলেও পাপ নেই। জানেন ও ব্যাটা আমার কতবড়

সর্বনাশ করেছে? উফ্! পঞ্চাশ হাজার টাকা ঠকিয়েছে ব্যাটা চোর? ইতর। বলছেন মারছেন কেন? মারবে না? শেষ করবো ওকে।

'আবার ব্যাগ তুলতেই কেশব ধমকে ওঠে—নাটক করবেন না। ও এখন পুলিশের হাতে আসামী, ওকে মারার কোন অধিকার আপনার নেই। আপনাকেও এ্যারেষ্ট করা হতে পারে।

ভদ্রলোক থামলো। প্রশান্ত বিবর্ণমুখে ওকে দেখছে। ওকে বলে অনুপবাবু—আপনি ভিতরে আসুন। কি করেছে আপনার এই প্রশান্ত আমাদেরও জানা দরকার।

ভদ্রলোক বলে-সেই কথা জানাতেই তো এসেছি মশায়।

ভদ্রলোক ওই কথা জানাবার জন্য এসেছে মালদহ থেকে। সঙ্গে কাগজপত্রও এনেছে সব, তার বক্তব্যের সত্যতার প্রমাণ হিসাবে। সে সবই বের করে এবার।

অনুপবাবু ওকে বসতে বলে এবার চায়ের অর্ডার দেয়। বলে—এককাপ চা খেতে হবে। প্রশান্তবাবুর জন্য খুবই ধকল গেছে। ওহে, প্রশান্তবাবুকেও চা দিও।

প্রশান্ত গুম হয়ে গেছে। আড়চোখে এক একবার দেখছে ওই ভদ্রলোকটিকে, আর তার তীব্র চাহনির সামনে মাথা নামিয়ে নেয়। আজ যেন সত্যিই ভেঙ্গে পড়েছে প্রশান্ত।

অনুপ চা খেতে খেতে দেখছে ব্যাপারটা। মনে হয় ওই ভদ্রলোককে দেখে প্রশান্ত রীতিমত ভয় পেয়েছে। ওর হাতটাও কাঁপছে। অর্থাৎ বেশ নার্ভাসই হয়েছে সে।

অনুপবাবু বলে সেই ভদ্রলোককে—বলুন কি কেস আপনার?

ভদ্রলোক বলে—এই এলাকাতেই রয়েছে প্রশান্ত—এই চোরটা, খবর পেয়েই এসেছিলাম থানায় ওর নামে ডাইরী করতে। ও আমাকে ধাপ্পা দিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা মেরেছে। দেখুন কাগজ পত্র।

অনুপবাবু শুধোয়, প্রশান্তকে—চেনো ওকে?

প্রশান্ত নীরবই থাকে। লোকটা গর্জে ওঠে

—এখন আর চিনতেও পারবে না। এইবার চেনাচ্ছি—সব কাগজপত্র আমি রেখেছি। এই যে, ওই হারামজাদা আমার পরিচিত এক ডাক্তারের চিঠি নিয়ে গেছল আমার কাছে মালদহে। চিঠিখানা বের করে দেখায় ভদ্রলোক অনুপবাবুকে।

অনুপবাবু চিঠিখানা দেখে অবাক হয়। ক্রমশঃ যেন ধাপে ধাপে এগোচ্ছে সে তার পথে। চুরির আসামী প্রশান্তর সম্বন্ধে জানছে অনেক কিছু। অনুপবাবু বলে।

—এ চিঠি কি করে পেলেন? ডাঃ আলুওয়ালার চিঠি দেখছি।

রতন বলে—ডাঃ আলুওয়ালা। স্যার, সেই মেয়েটি যে মার্ডার হয়েছিল, তার ড্রয়ারেও ডাঃ আলুওয়ালার প্রেসক্রিপশন পাওয়া গেছল। ওই প্রশান্তের সঙ্গেও মেয়েটার জানা চেনা ছিল।

অনুপবাবু কি ভাবছে। শুধোয় ভদ্রলোককে

—আপনি ডাঃ আলুওয়ালাকে চিনলেন কি করে?

ভদ্রলোক বলে—আমি বেশ ক বছর ওর ট্রিটমেণ্টে ছিলাম। মালদহে আমার ইটখোলা, রেশনের হোলসেল বিজনেস, আমবাগান আছে, ব্যবসাপত্র করি। এখানে আসতাম ওর কাছে চিকিৎসার জন্য, সেই সুবাদে ওঁর সঙ্গে পরিচয়। ভদ্রলোক আমার জন্য অনেক করেছিলেন, তাই ওঁর চিঠি নিয়ে একে যেতে আমিও ওকে ব্যবসায় সাহায্য করেছিলাম। এক চালান মালের দাম দিল, দ্বিতীয় চালানে বেশী মাল এনে পুরো টাকা হজম করে দিল মশায়? পঞ্চাশ হাজার টাকা, এই দেখুন চালানে ওর সই। আর কোন টাকাই দেয়নি আমাকে।

অনুপবাবু দেখছে প্রশান্তকে। শুধোয়।

—আর কি কি পুণ্য কর্ম করেছো অশান্ত? প্রশান্ত নও তুমি, অশান্তই। এবার শান্ত হবে।

অনুপবাবু বলে ভদ্রলোককে—আপনার স্টেটমেন্টও আমরা নোট করছি, আপনি একটা ডাইরী করে যান। টাকা পাবেন কিনা জানিনা—তবে প্রশান্তের সাজা হবেই।

ভদ্রলোক বলে—টাকা গেছে যাক, ও ব্যাটাকে সিধে করুন স্যার। যেন ভবিষ্যতে মানী লোকদের চিঠি নিয়ে গিয়ে যাকে তাকে এমনি করে আর না ঠকাতে পারে।

অনুপবাবু বলে—তাই হবে এবার। যা সব পুণ্যকর্ম করেছে তাতে বছর পাঁচেক এখন শ্রীঘরে থাকবেই, অবশ্য অন্য কোন পুণ্যকর্মের হিসাব যদি যোগ হয় তাহলে আবার কি হবে বলা যায়না। এর একটা ডাইরী করে নাও সতীশ।

ভদ্রলোক চলে গেছে ডাইরী করে

রাত বাড়ছে। অনুপবাবু ভাবছে কথাগুলো। ইরার খুনের মামলার তেমন বিশেষ কোন আলোকপাতই হয়নি এখনও।

কেশবও সেই দু'নম্বর খুনের লাশের কোন হাল সাকিম এখনও বের করতে পারেনি, যদিও সর্বত্রই, কাগজেও লোকের সেই লাশের ছবি বের হয়েছে।

ভরত মিত্র। নামটা কেমন রহস্যের মতই মনে হয়। তার কোন সূত্রই বের করতে পারেনি পুলিশ। হঠাৎ মনে হয় প্রশান্তের ব্যাপারটা।

রতনের কথাও। ইরা—প্রশান্ত—এই লোকটা সবাইকে চেনেন একজন, ডাঃ আলুওয়ালা। অনুপবাবু যেন একটা ক্ষীণ পথের রেখা দেখতে পান। ধাপে ধাপে সাবধানে এগোতে হবে। প্রশান্তই এখন তার হাতের প্রধান চাবিকাঠি।

রাত্রি নামছে। অন্ধকারের ছায়া নামে থানার বাইরের গাছ গাছালিতে। পথে গাড়ির ভিড়ও কমে আসছে। অনুপবাবু কি ভেবে বলেন।

—দরওয়ান। লক্ আপ্ থেকে প্রশান্তকে আনো।

প্রশান্তের দেহ মনের উপর দিয়ে সারাদিনে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। সব কেমন গোলমাল হয়ে গেছে তার। ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছে। লকআপের ছোট্ট ঘুপসি বন্ধ ঘরে এদিক ওদিকে কয়েকটা ছিচকে চোর, পকেটমার, মাতালও রয়েছে। কে মেঝেতেই প্রস্রাব করছে নেশার ঘোরে। হঠাৎ দরজা খুলতে প্রশান্তের ঝিমুনি ছুটে যায়।

—চলিয়ে। একজন পাহারাদার ডাকছে তাকে।

প্রশান্তের মনে হয় তাকে যেন এরা মুক্তিই দেবে। আর সে যে ভাবেই হোক আবার পালাবে এখান থেকে। কলকাতার এই অন্ধকার পথের জীবন থেকে দূরে কোন শান্ত গ্রামসবুজে গিয়েই সে থাকবে। আবার নতুন করে বাঁচার চেষ্টা করবে। প্রশান্তকে নিয়ে এল ওরা অনুপবাবুর ঘরে। অনুপ বলে—বসো।

প্রশান্তের চেয়ারের সামনে তীব্র আলোটা ঝলসে ওঠে। সামনে কিছুই দেখতে পায় না প্রশান্ত। আলোর ওই তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল রেখাগুলো তার মনের সব কাঠিন্যকে কি নিষ্ঠুর উত্তাপে গলিয়ে দিচ্ছে। ওদিক থেকে একটা কঠিন কণ্ঠস্বর জেরা করে।

—ডাঃ আলুওয়ালাকে তুমি চেন? জবাব দাও—

প্রশান্ত ঘামছে। ওর মাথাটা ঘুরছে। চোখের সামনে হাজারো সাদা কালো বিন্দু যেন পাক খাচ্ছে। জবাব দিতে চায় না সে। ধমকে ওঠে অনুপবাবু—বলো!

প্রশান্ত বলে স্বপ্নাবিষ্টের মত—হ্যাঁ।

আলোটা তীব্রতর হচ্ছে আর চোখের সামনে অসহ্য একটা আভা, তার মাথায় ঝড় বইছে। ঘামছে প্রশান্ত। চোখের দৃষ্টিও কেমন আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

কঠিন কণ্ঠ ধ্বনিত হয়—ভরত মিত্রকেও চেন?

প্রশান্ত চুপ করে থাকে—আলোটা আরও—আরও বেশী উত্তাপ ছড়াচ্ছে। প্রশান্তর চোখদুটো যেন বের হয়ে আসবে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়।

—জবাব দাও। ভরত মিত্রকে চেনো?

প্রশান্ত যেন কোন অতল অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে। সর্বাঙ্গে অসহ্য জ্বালা ওর দেহমনে। অনুপবাবু জোরে চীৎকার করে।

—জবাব দাও।

প্রশান্ত আর্তনাদ করে—চিনি!···বাঁচাও—ওকে চিনি।

আলোটা নিভে যায়। ঘরে জ্বলছে একটা মিটমিটে আলো টেবিলের উপর প্রশান্তের মাথা নামানো, কি দুঃসহ ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়েছে সে।

অনুপবাবু বলে সেণ্ট্রীকে—এক গ্লাস জল আনো, একে খেতে দাও। তারপর একে লকআপে রেখে আসবে।

অনেক রাত্রি হয়েছে।

বাড়ির কথা মনে পড়ে এবার অনুপবাবুর। মায়া বোধহয় এখনও জেগে আছে তার পথ চেয়ে। মেয়েটা অপেক্ষা করে করে ঘুমিয়ে পড়েছে। এই তার পারিবারিক জীবন।

কলকাতা মহানগরীর রাতের অন্ধকারেও তাদের চলা থামে না। ঘুমন্ত মহানগরীর এক অতন্দ্র প্রহরীদের সে একজন। এমন বহুজনই আছে, তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অন্ধকারের জীবদের চলাফেরা তবু ব্যাহত হয় না। কাজ তাদের করে যেতে হয়।

ডাঃ আলুওয়ালা কলকাতার নামী চিকিৎসক। তার বিরাট

প্র্যাকটিস, বিভিন্ন হসপিট্যাল, নামী নার্সিংহোমের সঙ্গে যুক্ত। আর তেমনি কর্মব্যস্ত। জনপ্রিয় চিকিৎসক।

নিজের চেম্বারেও প্রচুর রোগী আসে। তাদেরও বেশ কিছুদিন আগেই এ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হয়।

ডাঃ আলুওয়ালা কলকাতাতেই জন্মেছেন। ওর বাবার বিরাট কেমিক্যাল ফ্যাক্টরী। সেটা ওদের পারিবারিক প্রতিষ্ঠান। ডাঃ আলুওয়ালা কলকাতার কলেজে পড়াশোনা করে এখানের মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেছেন। আর তিনপুরুষ কলকাতায় বসবাস করে এখন প্রায় বাঙ্গালীই হয়ে গেছেন ওরা। বিদেশী ডিগ্রী নিয়ে এখানেই ফিরেছেন।

ডাঃ আলুওয়ালা বাঙ্গালীর মতই বাংলা বলেন, লিখতে পড়তেও পারেন আর বাঙ্গালী বন্ধু-বান্ধবও প্রচুর ছিল। বন্ধুরাও তাকে ডাক নামেই ডাকতো। বন্ধু বৎসলও আলুওয়ালা। এখন পসার, প্রতিষ্ঠা আর প্রাকটিসের চাপে সময় পান না বিশেষ, তবু বহু নামী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত পরোপকারী ভদ্রলোক। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। জীবনে প্রতিষ্ঠিত।

চেম্বারে দু'তিনজন নার্সও রাখতে হয়েছে

ক্লিনিকের কাজেও লাগে তারা। এছাড়া নিজের চেম্বারেও এক্সরে মেসিন রেখেছেন। শহরের নামী 'অস্থিবিশারদ', তাই এসব তার দরকার হয়।

ওয়েটিং রুমে রুগীদের ভিড় রয়েছে। একে একে রোগীদের ভিতরের চেম্বারে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করেন। ব্যবস্থাপত্র দেন তাদের।

সেদিন পার্কষ্ট্রীটের অভিজাত এলাকায় ওই বিরাট বাড়িটার সামনে এসে পুলিশের জিপটা থামলো। তার থেকে অনুপ ঘোষ নেমেছে সঙ্গে ওর সঙ্গীরা আর সেই প্রশান্ত।

ক'দিনেই প্রশান্তর সেই কেতাদুরস্ত চেহারাটা যেন ধ্বসে পড়েছে। দু চোখে অনিদ্রার ছায়া।

কোনমতে চলেছে অনুপবাবুদের সঙ্গে বাধ্য হয়েই। সেও ভাবেনি যে পুলিশ এবার তাকে এখানেই নিয়ে আসবে। বেশ বুঝেছে প্রশান্ত তাকে ধীরে ধীরে পুলিশ জালে জড়াচ্ছে, এ জাল কেটে বের হতে বোধ হয় পারবে না।

দাস এর আগে এই চেম্বারে এসেছিল ইরার প্রেসক্রিপশনের ব্যাপারে তদন্ত করতে। দাসই বলে—সেভেনথ ফ্লোর-এ যেতে হবে।

নার্সই বাধা দেয় ওদের চেম্বারে ঢোকার মুখে।

ক'জন লোককে ওয়েটিং রুমে ঢুকে ডাঃ আলুওয়ালার খোঁজ করতে দেখে বলে সে।

—ডাঃ আলুওয়ালা এখন ব্যস্ত। উইদাউট অ্যাপয়েন্টমেন্টে দেখা হবে না।

অনুপ ঘোষ নার্সকে একটু ওপাশে ডেকে নিয়ে ওর আইডেনটিটি কার্ডটা দেখাতেই নার্স চুপ করে যায়।

অনুপ ঘোষ বলে—ওকে খবর দেন। দেখা করতে চাই আমরা বিশেষ দরকার আছে।

নার্স ঘাবড়ে গিয়ে ভিতরে চলে গেল ডাক্তার আলুওয়ালাকে খবর দিতে।

ওরা তখনও অপেক্ষা করছে ওয়েটিং রুমে। সারা চেম্বারে একটা থমথমে স্তব্ধতা নেমেছে।

কেশব পাল সেই কেসের পর দিন থেকেই চক্কর মারছে। অবশ্য চক্কর মারতে তার আপত্তি নেই, যদি কাজ হয়। কিন্তু কাজ কিছুই হয়নি।

বেশ কিছুদিন ঘুরেছে নিউমার্কেট এলাকা, গড়িয়াহাট, বালিগঞ্জ

এলাকায় এক ডাইং ক্লিনিং-এর সন্ধানে সেই পাঞ্জাবী, পায়জামার মালিকের খোঁজে। কলকাতা শহরের এক এক অঞ্চলে যে এত ছোট বড় ধোলাইখানা আছে তা জানতো না। তামাম কলকাতার লোক যেন জামা কাপড়, পোষাকপত্র ধোলাইএর কাজে লেগে গেছে।

এত ময়লা—কচড়া জমে আছে শুধু পোষাকে, তাহলে শহরের গায়ে কত ময়লা জমে আছে, কত ঘন ময়লা জমে আছে এখানের মানুষের মনে তা কে জানে।

কেশব ধুরেছে আর ঘুরেছে।

কিন্তু সেই পাঞ্জাবী, পাজামার মালিকের কোন হদিশই পায়নি। অফিসে গেছে ক্লান্ত, ব্যর্থ মন নিয়ে।

অনুপ বাবু বলে—তাইতো হে কেশব, কিছু পাত্তা পেলেনা? কেশব হতাশা ভরে বলে,

—না স্যার।

অনুপবাবু বলে—তাহলে ওটা থাক। এবার অন্য খুনের ব্যাপারটাই দ্যাখো। খুঁজতে হবে সেই লেকের জলে ভেসে ওঠা লাশটার পরিচয়। নাহলে ও কেসেরও কোন কিনারা হবে না।

তুমি বরং এবার শহরের পথ ছেড়ে বস্তি—ওদিকের ঠেকগুলোয় খোঁজ করো—ওই দেবতাটি কে? কি তার পাত্তা।

কেশব ভাবছে কথাটা।

অনুপবাবু বলে—ওইখানে এ বেশে তো যাওয়া হবে না কেশব। কেশব বলে ও তা জানে।

বস্তির মানুষের পাত্তা বের করতে গেলে তাদের পোষাকেই তাদের একজন সেজে ঘুরতে হবে। একটা কেস এর কোন হদিশই করতে পারেনি কেশব।

নিজের উপরই রাগ হয়।

আবার এই কেসটার সন্ধান কিছু না আনলে তার প্রমোশনও হবে না, তা যত বড়ই কুস্তিগীর সে হোকনা কেন।

অনুপবাবু শুধোয়—পারবে? না অন্য কাউকে লাগাবো?

এটা যেন কেশবের কাছে অপমানেরই।

কেশব বলে—না স্যার। ওদিকে কিছু জানাশোনা সোর্সের করে খোঁজ খবর করছি, মনে হয় পাত্তা বের হবেই। তবে ওই লোকটার একটা ছবি তো চাই।

অনুপবাবু বলে—তা পেয়ে যাবে। তাহলে কাল থেকেই ও কাজেই নেমে পড়ো।

কেশব কৌতুহলী হয়ে শুধোয়—এই মার্ডার কেসটার কিনারা কিছু হলো স্যার?

অনুপবাবু বলে—এগোচ্ছি। ছাখো যদি এই লেকের খুনের কিছু ক্লু মেলে—হয়তো এ কেসও সলভ্ হয়ে যাবে। কেশব বলে—আমি চেষ্টা করছি স্যার।

কেশব তার পরদিন থেকেই বের হয়েছে নতুন এই কাজে। বারবার ছবিটা দেখে, মনে করতে চেষ্টা করে এই মূর্তিকে আগে কোথাও দেখেছে কিনা।

লালবাজারে ক্রাইম সেকশনে গিয়ে এই অন্ধকার জগতের বহু মূর্তিমানের ছবি ও দেখেছে। এর সঙ্গে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করে। বেশ জানে কেশব লেকের এই খুনটা হয়েছে অপরাধ জগতের মানুষদের নিজেদের মধ্যে গোলমাল না হয় মতান্তরের জন্যই। ভাগ বাটোয়ারা নিয়েই এমনি খুন জখম ঘটানো অপরাধ জগতের মানুষদের কাছে স্বাভাবিক কাজই!

কিন্তু এত চেষ্টা করেও কেশব কোন পাত্তা পায় না।

বেশ বুঝেছে এবার তাকে বস্তিতেই ঘুরতে হবে।

কেশব ক'দিন ধরে লেকের এদিকের বেশ কিছু বস্তি, চায়ের দোকান—বাজারে এখানে ওখানে ঘুরেছে। লেকের জলে এইসব বস্তির কেউ খুন হয়েছে কিনা জানার চেষ্টা করেছে। বস্তিতে কোন

পরিবারের কোন মানুষ নিখোঁজ হয়েছে বা খুন হয়েছে জানতে চেষ্টা করে। কিন্তু কোন খবর তেমন পায়নি।

কেশবকে দেখলে এখন চেনা যাবে না।

মাথার চুলগুলো ধূলি মলিন, পরনে একটা ময়লা লুঙ্গি-গেঞ্জি। কোমরে বাধা তেলচিটে গামছা। মুখে একমুখ দাড়ি—আর বিড়ি টানছে ফুক ফুক করে।

বস্তির ওদিকে একটা অর্জুনগাছের নীচে জলকাদায় পচা পানাপুকুরে ক'টা শুয়োর কাদা মাখছে। খাটালের ছাড়া মোষগুলো ভুসভাস ডুবছে উঠছে, সেই জলার ধারে ঝুপড়িতে একটা চুল্লুর ঠেকে বসে আছে কেশব।

দেখছে দুচারজন লোককে, মেয়ে মর্দ—সকলেই যেন ওই চুল্লু খেয়েই বেঁচে আছে। পাশে রেল লাইন—ওখানে রাতের অন্ধকারে মালগাড়ি থেকেও মালপত্তর নামে।

বেশ ভালো জবরদস্ত এলাকা।

কেশবের মনে হয় সেই মূর্তিমানের চেনাজানা কেউ এদিকেই মিলবে।

কেশব উঠে গেল ওদিকে বস্তির মধ্যে।

কেশব পাল বস্তির মধ্যে এদিক ওদিক ঘুরেছে—সেই লোকের জলে ভেসে ওঠা লাশ-এর খোঁজে। নামটাও জানে না তার। পুলিশের খাতায় শুধু পরিচয় তার বেওয়ারিশ লাশ বলেই।

ছবিটা সঙ্গেই রয়েছে।

অবশ্য কেশবকে দেখলে এখন চেনাও যাবে না। মাথার চুলগুলো উস্কোখুস্কো, দাড়িও জমেছে গালে, জামা প্যান্ট ময়লা, লটপট করছে।

কেশব শুধোয়—মাল কোথায় পাবো এখানে ও ভাই?

—মাল? লোকটা চাইল।

কেশবের চাইবার মত অবস্থা নেই। টলছে সে। পকেট থেকে একটা দোমড়ানো দশটাকার নোট বের করে বলে লোকটাকে।

—দেশী মাল। চুল্লু—মিলবে?

লোকটা দেখেছে ওই টাকাটা। কেশব ক'দিন বিভিন্ন এলাকায় ঘুরেছে। পুলিশের খাতায় চোর পকেটমারদের দু'চারজনের নামও আছে। অনেকেরই খোঁজ পেয়েছে। ন্যাপা বলে লোকটার পাত্তা পায়নি। এদিকের বস্তিটার সুনাম আদৌ নেই। এদিকেই এসেছে কেশব পাল এই বেশে। লোকটাকে স্থির দৃষ্টিতে চাইতে দেখে কেশবের মনে হয় লোকটা যেন টোপ গিলবে কিনা ভাবছে। কেশব পকেট থেকে আর কিছু টাকা বের করে বলে,

—তুমিও খাবে। ভরপেট খাওয়াবো। আমিও খাবো।

লোকটা এবার টাকাটা ছোঁ মেরে নিয়ে পকেটস্থ করে বলে।

—এসো। মাল পাবে বৈকি।

কেশব টলতে টলতে বলে—ফাস্‌কিলাস মাল চাই কিন্তু। পেলে খুশ করে দেব। হ্যাঁ।

—তোমাকে মাল দিতে পারবে না নিতাই এটা একটা কথা হোল? চলো—কত খাবে দেখবো। লোকটা বলে।

বস্তির ওদিকে একটা ডোবা—পানায় ভর্তি। ওদিকে বিশেষ কেউ আসেনা এখন। দুপুরের রোদ পড়ে আসছে। গাছের ছায়ায়।

কেশব আর সেই লোকটা বসে মদ গিলছে। লোকটা মাছের মত মদ গিলছে আর কেশব কৌশলে তার পকেট থেকে জলভর্তি বোতলে চুমুক দিয়ে বকে চলেছে। বলে কেশব—শালা ন্যাপাকে দেখছি না, শালা মাল খাওয়াবে বলেছিল। জিগরী দোস্ত কিনা—. তা তোর নাম কি? ন্যাপা?

লোকটার মদ পেটে পড়েছে। বেশ চাগিয়ে উঠেছে সে।

বলে—ন্যাপা। আমার নাম ন্যাপা কেন হবে? সে ব্যাটা তো ছিঁচকে চোর! কোথায় চুরি করতে গে প্যাদানির চোটে খতম হয়ে লেকের জলে মরেছে—ও শালার সঙ্গে নেত্যর তুলনা? আমি ওসব করি না।

ন্যাপা! লেকের জলে ডুবে মরেছিল—একি সেই একই লোক। কেশব সাবধান হয়ে ওঠে। শুধোয়।

—তা বটে। তা ন্যাপাকে চিনতে নেত্য?

নেত্য বলে—চিনতাম বৈকি। কত ঘ্যান ঘ্যান করতো কাজের জন্যে। ওসবে আমি নেই বাবা! চুরি করা মহা পাপ।

কেশব সায় দেয়—যথার্থ। তা ন্যাপা শালা কি করতো তারপর? নেত্য গলায় ঢুঢোক তাজা মদ ঢেলে বলে।

—শেষ মেয কোন শ্লা এক ফট্‌কের সঙ্গে জুটলো। দুজনে খুব গলাগলি। বেদম মাল খাচ্ছে—বলি, শালা মরবি? তা কে শোনে কার কথা? মরল একদিন লেকের জলে,

সংবাদটা মিলে যাচ্ছে কেশবের। বলে সে।

—আর ফটকে? সে কোথায় গেল দোস্তকে ফাঁসিয়ে!

নেত্য মদ গিলতে গিলতে বলে—সে শালা নির্ঘাৎ গা ঢাকা দিয়েছে। মনে হয় এই শালারই কাজ। বখরার ব্যাপার নে গোলমাল হয়েছে বোধহয়, দিয়েছে ওর লাশ গিরিয়ে। লে হালুয়া।

নেত্য মদ গিলতে থাকে। কেশব শুধোয়।

—ফটকে দেখতে কেমন?

—বেশ দশাসই পেটা চেহারা। ব্যাটার গায়ে জোর আছে, আর হিম্মতও আছে। ন্যাপা মরার পর আর তাকে এখানে বিশেষ দেখিনি। আসতো তখন পেরায় ন্যাপার কাছে! তারপর দেখি শ্যালা হাওয়া কেটেছে। পাপী মন তো—এলে যে ফেঁসে যাবে।

কেশব পেঁয়াজিও আনিয়েছে। সেগুলো মাতাল নেত্যর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—খাও নেত্যদা। যা বানিয়েছে পেঁয়াজি।

নেত্যও সায় দেয়—হ্যাঁ, শালা মালের চাঁট জব্বর বানায়। ন্যাপার সঙ্গে এখানে আসতাম। শালা জব্বর খানেবালা ছিল হে! টেঁসে গেল।

নেত্য গবগব করে গিলছে।

কেশব জড়িত কণ্ঠে তার ভাবনাটা প্রকাশ করে—কে মারলে তাহলে ন্যাপাকে? কিছু খবর পেলে?

নেত্য পিঁয়াজী চিবুতে চিবুতে বলে—

—কে জানে? তুসরা দলের কেউ হতে পারে। খার ছিল মৌকা বুঝে ঝেড়েছে।

—মদের নেশায় চোট পেয়ে ডোবেনিতো।

কেশবের কথায় নেত্য বলে—মদের নেশায় বেটোর হবে ওই ন্যাপা? শালা পাঁচ বোতল চুল্লু খেয়েও টাইট থাকতো, জানিস?

—তবে? কে ঝাড়ল মাইরি? কেশব খুবই যেন সমস্যায় পড়ে বিড় বিড় করছে। নেত্য বলে।

—বল্লাম তো অ্যান্টি পার্টি, নাহলে চুরির বখরার গোলমাল হতে ওই শালা ফটকেই ব্যাটাকে বেদম কেলিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। মরুকগে শালারা। অচেনা লোকের সঙ্গে এসব কাজ করি না বাবা। গুরুর নিষেধ। বুউলা—তুমিও করবে না।

কেশব কি ভাবছে। ওই মৃত লোকটা তাহলে ন্যাপাই। শুধোয়।

—ওর মাগ ছেলে আছে?

হাসে নেত্য—এ্যা! মাগ, ছেইলা? শ্যালা ন'নম্বরের ওই যে পাকুড় গাছ দেখছো, ওখানেই ক্ষান্তির ঝুপড়ি। ওই মাগীর ওখানেই তুবেলা ব্যাটা খেত আর পড়ে থাকতো! বলতো ও নাকি শালার মাগ। ইয়ে করি শালার মুখে।

নেত্য মদের ঝোঁকে বিড়বিড় করছে চোখ বুজে, ক্রমশঃ বসা অবস্থা থেকে মাটিতে শুয়ে পড়ে নেত্যলাল।

কেশবও ধীরে ধীরে উঠে ওই পাকুড় গাছের নীচে ক্ষান্তি নামক কোন সতীসাধ্বীর সন্ধানে এগোলো। নেত্য তখন বিড় বিড় করছে চোখ বুজে।

কেশবের এখন আর নেশার জড়তা নেই।

সহজভাবেই এগিয়ে যায় ওইদিকে কেশব পাল। মনে হচ্ছে ফটিকের সন্ধান এবার পাবে। কিছু খবরও মিলবে।

দেখা যায় কলতলায় একটা মেয়ে কি কাচছে। মোটামত মেয়েটা, দেহে আবরণও তেমন নেই। আশপাশে লোকজন-অন্যরা রয়েছে। কিন্তু তার ওসবে ভ্রুক্ষেপ নেই। ভারি বুক—গাগতর কাঁপিয়ে সে কাঁথা আছড়াচ্ছে। আর একটা ছেলে ওই অবস্থাতেই বুকে মুখ লাগিয়ে মাই খাবার চেষ্টাও করছে। মেয়েটা খিস্তী করে।

—আটকুঁড়োর ব্যাটার জন্য মরবো এইবার। সেটাতো গেছে মরেছে তবু এটাকে নে গেল না কেনে যম। শান্তি পেতাম।

হঠাৎ কেশবকে দেখে চাইল। কেশব ওর দাওয়ায় একটা থলিতে কিছু চাল—কিসব রাখতে মেয়েটা চীৎকার করতে গিয়ে পারলো না, দেখছে। শুধোয়—তুমি কে?

কেশব-এর উস্কোখুস্কো চুল, ওই ময়লা পোষাক গোঁফদাড়ি দেখে মেয়েটা ভেবেছে ওদেরই একজন, অন্ততঃ শালা যে ভদ্দরলোক নয় তা ভেবেছে। কেশব কানের খাঁজ থেকে আধপোড়া বিড়ি ধরিয়ে টান দিয়ে দাওয়ায় উবু হয়ে বসে বলে গলা নামিয়ে।

—ফটিকদা পাঠাইছে গো। তুমিই তো ক্ষ্যান্তি—

ক্ষ্যান্ত দেখছে ওকে। এবার ফোঁস করে উঠে।

—সেই শালা বুনো ষাঁড়কে বলবি, আমার মরদকে মারলেক উ, আমি শালা ওকে ছাড়বো নাই। দু'চারদিন ইখানে এসে আমাদের লুকটাকে ফুঁসলে ফাসলে চুরির কাজে নামাই শেষমেশ মারলেক? আমি ছেড়ে দেব শালাকে?

কেশব শুনছে ওর কথাগুলো।

ন্যাপা আর ফটিক-এর খবর বের করেছে সে। ন্যাপাই সেই লাসটা। আর ফটিক অন্যজন। কেশব বলে, দরদভরা স্বরে।

—তা পুলিশে গে বলনি কেন? ন্যাপার লাশতো পুলিশই পেয়েছে।

ক্ষ্যান্তি ফুঁসে ওঠে—খুব বললি যা হোক! সেটা গেল—আমি পুলিশে গেলে আবার আমাকে ধরে টানুক, ফটকে তো কেটে পড়লো তা সে মুখপোড়া সেই মুরারীপুকুরে আছে না সটকেছে ভাই-এর বাসা থেকেও কে জানে। খপর নেবো এবার তার।

কেশব শুনছে কথাগুলো। বলে কেশব।

—মুরারী পুকুরে। সেখানেই যেন দেখেছিলাম।

—হ্যাঁ ওর ভাই—সেই যে কলের মিস্ত্রী ভূতোর বাড়িতে ছেলো তাখন।

কেশব খবরটা শুনে বলে—কে জানে কোথায় আছে, আমাকে বললে দেখা হতে, ন্যাপাদাকে চেনতাম—তাই ইগুলো নে এলাম।

বলে ক্ষ্যান্তি—দেখা হলে বলবি, ষাঁড়ের মত গতর আছে, তবে এত ভয় কিসের। এখানে আসতে বলবি—ন্যাপাকে খুন করার জবাব আমিই দিব শ্যালাকে।

কেশব কেটে পড়ে পায়ে পায়ে। একটা খবর সে পেয়েছে নামও জেনেছে।

কেশব পায়ে পায়ে সরে এল, ভাব দেখায়

যেন এই মেয়েটাকে ভয়ই পেয়েছে সে। সেই কালোমেয়েটা তখনও গর্জায়—দেখে নোব ক্যামন সে মরদ। বলবি তাকে।

কেশব পাল ওই বস্তি থেকে বের হয়ে আসছে,

কে বলে—মাল খাওয়াবে না।

একটা মেয়ে। বিড় বিড় করে কেশব—মাল! পয়সা নাই মাইরী!

বেশ বুঝেছে এখানের কাজ তার শেষ। কোনমতে নিরাপদে বের হয়ে আসতে হবে। তারপর আবার খোঁজ খবর নিতে হবে অন্যত্র সেই মুরারীপুকুর বস্তিতে। সেখানে জল-কলের মিস্ত্রী কোন ভূতনাথ এর ডেরা বের করতে হবে।

মেয়েটা কেশবকে গায়ে টলে পড়তে দেখে ধাক্কা মারে।

—যাও তো হে। মাল খাওয়াবার মুরোদ নাই আর গা গতরের দিকে নজর।

কেশব কোন রকমে টাল সামলে বের হয়ে এল।

লেকের এদিকে পুকুরে স্তব্ধতা নেমেছে। ছায়া নামে চারিদিকে। দু'একজন লোক—দু'এক জোড়া কপোত কপোতী বসে আছে, ওরা নিজেদের চিন্তায় মগ্ন।

কেশব ভাবছে নিজের কথা!

এবার একটু জিরিয়ে নিয়ে যাবে মুরারীপুকুরেই আবার সেই ভূতনাথের সন্ধানে, সেখানে তার ভাই ফটিক কে চাই। তার আর কোন পরিচয় জানে না।

তবে জেনেছে এই মেয়েটার কাছ থেকে ফটিক নাকি দেখতে বুনো ষাঁড় এর মত। আরও বুঝেছে মেয়েটা ফটিককে চেনে। কেশবের মনে হয় ব্যাপার খুনের কিনারা হতে পারে ফটিককে দেখেই কিন্তু ওই ইরার হত্যার কোন কিনারা হবে কিনা জানেনা,

দুপুর গড়িয়ে বিকাল নামছে।

কেশব একটা বাসে উঠে পড়লো। গন্তব্য স্থল তার এখন মুরারীপুকুর বস্তি। খুঁজতে হবে ফটিককে।

অনুপ ঘোষ দলবল নিয়ে অপেক্ষা করছে ডাঃ আলুওয়ালার ওয়েটিং রুমে, দুদশ জন রোগী—তাদের লোকজন ও রয়েছে। বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরেরই লোক তারা। এখানে আসার সাধ্য সাধারণ মানুষের নেই, ডাঃ আলুওয়ালা যে বেশ দামী ডাক্তার, সমাজের উচু তলার সম্মানীয় মানুষ তা দেখেই বোঝা যায়। তারাও দেখছে এই পুলিশ আর প্রশান্তকে। তার এখানে এভাবে আসতে কেমন বিশ্রী লাগে অনুপের, কিন্তু উপায় নেই। চাকরী বলে কথা।

ডাঃ আলুওয়ালাও পুলিশ আসার খবর পেয়ে তার চেম্বার থেকে

রুগীদের সরিয়ে দিয়ে ঘর ফাঁকা করে অনুপবাবুদের ভিতরে আসতে বলেন। নার্সকেও বলেন

—তুমিও বাইরে থাকো। বরং কয়েক কাপ চা পাঠাবার ব্যবস্থা করো ওদের জন্য।

নার্স বের হয়ে গেল। অনুপ ঘোষ, রতনকে সঙ্গে নিয়ে ডাঃ আলুওয়ালার ঘরে ঢুকলো।

অনুপ ঘোষ বলে—নমস্কার স্যার। একটু বিশেষ দরকারে আপনার মত ব্যস্ত ডাক্তারকেও বিরক্ত করতে হলো। তারজন্য দুঃখিত।

ডাঃ আলুওয়ালা বলেন—না, না। বসুন।

পেছনেই প্রশান্তকে দেখে ডাঃ আলুওয়ালা একটু চমকে ওঠেন। সেটা ক্ষণিকের জন্যই। তারপর সহজ হবার চেষ্টা করে বলেন তিনি।

—বলুন আপনাদের জন্য কি করতে পারি ?

সেই মুহূর্তেই মিঃ দাস প্রশান্তকে নিয়ে ঢুকেছে। ডাঃ আলুওয়ালা পুলিশের সঙ্গে প্রশান্তকে অমনি বিপর্যস্ত এলোমেলো অবস্থায় ঢুকতে দেখে চমকে ওঠেন, দেখছেন প্রশান্তকে।

ওকে লক্ষ্য করছে অনুপ ঘোষ। তার সন্ধানী দৃষ্টিতে একটা অতল রহস্য এবার যেন পরিষ্কার হয়ে আসছে। এই ক'দিনের দিনরাত্রির পরিশ্রম বোধহয় সার্থক হতে চলেছে। অন্ততঃ একটা অসামাজিক মানুষকে তারা আইনের সামনে বিচার আর শাস্তির জন্য হাজির করতে পারবে।

অনুপ ঘোষ প্রশ্ন করে—ডাঃ আলুওয়ালা, ওই লোকটাকে চেনেন ?

ডাঃ আলুওয়ালার চোখের সামনে কি এক সর্বনাশা খাদটা হাঁ করে আসে। ওর অতল অন্ধকারে তার এতদিনের সব মান, সম্মান, প্রতিষ্ঠা—বংশমর্যাদা সব হারিয়ে যাবে।

নিজের জীবনের একটা ভুলের জন্য এমনি করে খেসারত দিতে

হবে এই শয়তানের জন্য তা ভাবেন নি আলুওয়ালা। আজ তার সামনে বাঁচার কোন পথ নেই সব কিছু ফুরিয়ে গেছে।

ডাঃ আলুওয়ালা নিমেষের মধ্যে তার কর্তব্য স্থির করলেন। এই ভুলের জন্য চরম মূল্য দিয়েই প্রায়শ্চিত্ত করবেন তিনি। তবু নিজের সম্মান হারাবেন না।

চকিতের মধ্যে ডাঃ আলুওয়ালা এগিয়ে গিয়ে আটতলার উপর থেকে জানলা দিয়ে গলে নীচে ঝাঁপ দেবেন। একটি মুহূর্ত। তারপর তার দেহটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়ে একটা মাংসপিণ্ডে পরিণত হবে। আলুওয়ালা এগিয়ে চলেছে জানলার দিকে।

ওর চাহনি এখন বিভ্রান্ত, শূন্য।

অনুপ ঘোষ পুরোনো পুলিশ অফিসার। ও জানে এরপর কি ঘটতে পারে। একটা নামী সমাজের প্রতিষ্ঠিত মানুষ ভেঙ্গে পড়বে, কিন্তু এভাবে লাফ দিয়ে নিজেকে শেষ করবে তা ভাবতে পারেনি। তবু ডাঃ আলুওয়ালা লাফ দিতে যাবে, ছুটে গিয়ে অনুপ ঘোষ তার একটা পা-ই ধরে ফেলেছে, আর জানলার বাইরে আটতলার উপর শূন্যে ঝুলছে বাকী দেহটা।

সেই ঝুলন্ত দেহটাকে ছেড়ে দিলেই নীচে পরে চুরমার হয়ে যাবে। অনুপ ঘোষ সেই অবস্থায় ওর ঝুলন্ত দেহটা ধরে চীৎকার করে—দাস। কুইক।

মিঃ দাসও ছুটে গিয়ে জানলার বাইরে বিপজ্জনকভাবে ঝুঁকে পড়ে ডাঃ আলুওযালার দেহটাকে টেনে জানলার ভিতরে নিয়ে আসে।

কি এক উত্তেজনায় তখন কাঁপছেন ডাঃ আলুওয়ালা। অনুপ ঘোষ ওকে চেয়ারে বসিয়ে ওয়াটার কুলারের ঠাণ্ডা জল মুখে চোখে দিয়ে সুস্থ করার চেষ্টা করে।

নার্স চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকেছে, তাদের 'বস'-এর ওই অবস্থা দেখে সেও কেঁদে ফেলে। মনে হয় পুলিশই কিছু করেছে তার। অনুপ ঘোষ বলে—চা-টা রেখে চলে যাও। কিছুই হয়নি।

নার্স কঠিনস্বরে দাবড়ানি খেয়ে বের হয়ে গেল। তবু তার মুখেচোখে যেন কি বিপদের ছায়া ঘনিয়ে আসে। সে এতদিন ধরে ডাঃ আলুওয়ালাকে দেখছে, কিন্তু এর আগে কখনও এভাবে তাকে ভেঙ্গে পড়তে দেখেনি, মনে হয় কি যেন একটা দারুণ সর্বনাশই ঘটেছে।

সর্বনাশই ঘটেছে ডাঃ আলুওয়ালার।

নিজেকে চরম অপমানের হাত থেকে তাই বাঁচাবার জন্যই ওই পথ নিতে গেছলেন। কিন্তু সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে।

অনুপ ঘোষ তার ব্যাগে করে ইরার ফ্ল্যাটে পাওয়া পায়জামা-পাঞ্জাবী দুটো নিয়ে গেছলেন, সেগুলো টেবিলে বের করে শুধায় ডাঃ আলুওয়ালাকে।

—এগুলো আপনার? এই পাঞ্জাবী পায়জামা!

বিবর্ণ মুখে উদাস চাহনিতে সেগুলোকে দেখছেন ডাঃ আলুওয়ালা। তার আর করার কিছুই নেই। পুলিশ যে এভাবে তার সবকিছু খুঁজে পাবে তা ভাবেননি তিনি।

অনুপ ঘোষ বলে—জবাব দিন!

আলুওয়ালা মাথা নাড়ে—হ্যাঁ।

—ভরত মিত্র কে? চেনেন তাকে?

অনুপ ঘোষ জেরা করে স্থির কণ্ঠে। চেয়ে রয়েছে ওর দিকে।

ডাঃ আলুওয়ালার টাক জুড়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে। বলেন তিনি

—আমার ডাক নাম ভরত। আমার কলেজের বন্ধুরা মাঝে মাঝে তাতে মিত্র নামটা জুড়ে দিয়ে ভরত মিত্র বলেই ডাকতো। আমার ওই আলুওয়ালা পদবীটা তারা নাকি সম্মানজনক বলে মনে করতো না।

অনুপ ঘোষ ভাবছে ডাঃ আলুওয়ালার কথা। এমন একজন

সম্মানিত ব্যক্তি যে একাজ করতে পারবেন না তা ওর মনে হয়। কিন্তু পাপচক্রে যেভাবে উনি জড়িয়ে গেছেন তাতে ওর বিপদের সম্ভাবনাও আছে। অনুপ ঘোষ সব ব্যাপারটা বলে প্রশ্ন করে—

—ওই প্রশান্তের সঙ্গে আপনার চেনাজানা হলো কি করে? ওই মেয়েটি—ইরাকে কিভাবে চিনলেন? সব কথা খুলে বলুন, সাহায্য করার চেষ্টা করবো।

সে এক বিচিত্র ইতিহাস। ডাঃ আলুওয়ালা বলেন, প্রশান্তকে দেখিয়ে,

—ওই লোকটাই আমার সুনাম প্রতিষ্ঠাকে কাজে লাগিয়েছিল নিজের স্বার্থে আমার অজ্ঞাতে। আমাকে এভাবে বিপদে ফেলেছিল। অবশ্য দুর্বলতা আমারও ছিল। আর সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিল ওই প্রশান্ত। ও একটা জঘন্য শয়তান, নীচ। বলেন তিনি।

—ইরাকে প্রথম চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসে এখানে প্রশান্তই। আমি তার চিকিৎসা করেছিলাম। সেই সূত্রে দু'একবার তার ফ্ল্যাটেও গেছি। মাঝে মাঝে সেখানে যেতাম। প্রশান্ত তারপরই আমাকে নিয়ে খেলা শুরু করলো আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে।

আমাদের সমাজে বন্ধুবান্ধবের মধ্যে সামাজিক মেলামেশা পার্টি এসবের রেওয়াজ আছে। আজ এখানে, কাল অন্যের বাড়িতে পার্টি—নিমন্ত্রণ লেগেই থাকে।

ওই লোকটা ওই প্রশান্ত ক্রমশঃ সেই খবরগুলো ওর লোকদের পৌঁছে দেয়। দেখা যায় সেই পার্টির সন্ধ্যায় অতিথিদের কারোও না কারো ফ্ল্যাটে ডাকাতি হচ্ছে, তাদের ধন সম্পত্তি, গহনাপত্র সবই চুরি হচ্ছে। প্রশান্ত ওর লোকদের দিয়ে সেইসব অরক্ষিত ফ্ল্যাটে চুরি করতো।

—এদের চেনেন? প্রশান্ত ফর্দটা দেখায়।

সে বলে চলেছে একে একে চুরির লিষ্টটা।

ডাঃ আলুওয়ালা বলেন—হ্যাঁ। ওদেরই কথা বলছিলাম। ওরাই ওর চুরির টার্গেট।

প্রশান্ত শুনছে বিবর্ণ মুখে।

ডাঃ আলুওয়ালা বলেন—লোকটা আমাদের এইসব পার্টির খবর রাখতো, আমার অফিসে আমার বাড়ির পার্টির চিঠিও পাঠাতো ওদের কাছে। দু'একজনের বাড়িও গেছে আমার নাম নিয়ে। ও তাদের নানাভাবে ঠকিয়েছে।

অনুপ ঘোষ বলে—মালদহে ভুবন সোমকেও আপনার চিঠি নিয়ে গিয়ে পঞ্চাশহাজার টাকা ঠকিয়েছে। আলুওয়ালা বলেন,

—হতে পারে। ভুবনবাবুও এসেছিলেন আমার কাছে। আমিই ওর ঠিকানা দিয়েছি তাকে। তখন ভাবিনি যে এতবড় সর্বনাশ করেছে তারও।

অনুপ ঘোষ বলে—আপনি জানতেন যদি ও এইসব করছে, তখন পুলিশকে কেন জানাননি? তার কার্য কলাপের কথা।

ডাঃ আলুওয়ালা বলেন—সঠিক প্রমাণ কিছু পাইনি। আর ওই শয়তান তখন ইরাকে জড়িয়ে আমাকেও ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করেছে। বলতো ইরাকে দিয়ে কেস করাবে, আমার সামাজিক সুনাম বিপন্ন করবে। তাই আমিও মুখ বুজে সহ্য করেছি।

অনুপ ঘোষ বলে—এবার ওর ব্যবস্থা করছি। কিন্তু ইরাকে খুন কে করতে পারে? কেনইবা করবে?

ডাঃ আলুওয়ালা বলেন—সেটা প্রশান্তকেই প্রশ্ন করুন। হতে পারে চুরির বখরা নিয়ে প্রশান্তের সঙ্গে ইরার গোলমাল হতে ওই তাকে খুন করেছে, নাহয় যারা চুরির কাজটা করতো, তাদের সঙ্গে গোলমাল হতে তারাই খুন করেছে, পরে প্রশান্তকেও শেষ করে তাদের সব মাল কেড়ে নিতো। ন হয় প্রমাণ লোপ করতো।

অনুপ ঘোষ চমকে ওঠে।

প্রশান্তকেও খুন করতে গেছলো কারা, আর ইরাকে তারা যে

ভাবে খুন করেছে ঠিক সেই ভাবেই। এ খুন তাদেরই কাজ আর প্রশান্ত নিশ্চয়ই তাদের জানে।

অনুপ ঘোষ বলে ডাঃ আলুওয়ালাকে,

—আপাততঃ আর কিছু করার আমাদের নেই। আপনি আমাদের না জানিয়ে কলকাতার বাইরে যাবেন না। এ কেসের ব্যাপারে আপনাকে দরকার হবে।

ডাঃ আলুওয়ালা বিবর্ণমুখে বলে,

—এ নিয়ে আবার গোলমাল হবে নাতো?

অনুপবাবু বলে—আপনার অবস্থা বুঝতে পারছি। আমাদের উপর নির্ভর করতে পারেন। অকারণে আমরা কিছুই করবো না যাতে আপনার সুনাম বিপন্ন হতে পারে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। বুঝেছি, প্রশান্ত আপনাকে এক্সপ্লয়েট করেছে।

ওরা বের হয়ে এল।

এবার অনুপ ঘোষ বলে—প্রশান্ত, তোমার জারিজুরি সব শেষ হয়ে গেছে। এইবার বলো—সেই খুনীর নাম কি? তোমাকে বলতেই হবে।

—আমি জানিনা স্যার। প্রশান্ত বলে।

অনুপবাবু চাইল ওর দিকে। রতন গর্জে ওঠে—মারবো এক রদ্দা। শালাকে—

অনুপবাবু থামায়, রতনকে।

প্রশান্ত বলে—জানিনা স্যার। তাদের নাম জানিনা।

—তারা। অর্থাৎ খুনী একজন নয়, একাধিক। অনুপ ঘোষ বলে ওঠে। প্রশান্ত চুপ করে থাকে।

অনুপবাবু বলে—চুপ করে থাকলেও কি করে পেট থেকে কথা বের করতে হয় তা আমার ভালোই জানা আছে প্রশান্ত। আর বাধ্য করো না সেটা করতে।

ওরা থানাতে এসে গেছে। অনুপবাবুরা থানা অফিসে গিয়ে ঢুকে দেখে বসে আছে সেই বিচিত্র পোশাকে কেশব পাল। ওর মুখ চোখে খুশির আভা জাগে।

বলে সে—এ দুটোর মধ্যে কানেকশন খুঁজে পেয়েছি স্যার।

—মানে?

কেশব বলে—ওই চুরি আর খুন। একটা খুনী ছিল ওই ব্যাটা ন্যাপাই। যেটাকে লেকের জলে খুন হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেছল। আর একটা ফটিক—সে ব্যাটা ফটকে পালিয়েছে। ওরাই খুনী স্যার। ওই দুটোর কাজ ন্যাপা আর ফটকে। অনুপবাবু এবার প্রশান্তর দিকে চাইল। গর্জে ওঠে—

—চেনো ওদের? ওই ন্যাপা আর ফটকেকে?

প্রশান্ত আমতা আমতা করে

—ইয়ে, না স্যার। জানিনা স্যার—বিশ্বাস করুন।

—চোপ। ধমকে ওঠে অনুপবাবু। কেশব পাল এতদিন ধরে সামলে ছিল, ক্রমশঃ ওই শয়তানের পরিচয় ও পাচ্ছে, আজও এত কাণ্ডের পরও ওকে সাধু সাজতে দেখে গর্জে ওঠে

—শালা শয়তানের বাচ্চা, ন্যাকা। কিছুই জানোনা? বল কারা ওরা? নাহলে তোর—

কেশব শক্তহাতে প্রশান্তের গলা টিপে ধরেছে, অনুপ ওকে ছাড়িয়ে দিয়ে বলে—কি করছো কেশব? এখনও আসল কেসের কিনারাই হ'লনা।

কেশব গর্জায়—ও ব্যাটা কিছু না বলুক। কেশব পাল এবার খুনী ওই ফটিককে বের করবেই আর দুটোকেই ফাঁসীতে ঝোলাবে। দেখে নেবেন স্যার। ও শালা মুখ বুজে থাকলেও বাঁচবেনা।

প্রশান্ত অসহায় আতঙ্কে কাঁপছে।

বলে সে—আমি ওদের মুখ চিনি, কিন্তু ওদের হাল সাকিন জানিনা স্যার। ওরা ভাগ নিত কাজ করতো। চার আনা বখরা

পেতো। তারপর অর্দ্ধেক বখরা চেয়ে বসতে ওদের শাসালাম পুলিশে দেব। ইরাও শাসিয়েছিল—ওদের পুলিশের ভয় দেখিয়েছিল। তাই ইরাকে শেষ করেছে। তারপর আমাকেও—

অনুপবাবু বলে—কোথায় পেয়েছিলে তাদের।

—কাঁঠালবাগান বস্তির এক মদের দোকানে। ফটিক ওখানে আসতো। পরে ওই ন্যাপাকেও আনে তার সঙ্গে চুরি করার জন্য।

—ন্যাপা মরলো কেন? কে মেরেছিল তাকে? তুমি?

প্রশান্ত জানায়—বিশ্বাস করুন স্যার। এর বেশী কিছুই জানিনা। ওদের ঠিকানা ওরা দেয়না। আমাকেও দেয়নি।

বিড়বিড় করছে অনুপবাবু—কাঁঠালবাগান বস্তি। মদের ঠেক—এবার খুনের মামলার একটা সম্পূর্ণ চেহারা কার্য কারণ পরিষ্কার হয়ে আসে। কিন্তু মূল আসামীদের অন্যজন ফটিক বেপাত্তা। তাকে ধরতেই হবে।

অনুপবাবু বলেন--মনে হয় এরা পেশাদার চোর, ডাকাত, খুনী। তাই এদের ধরা বেশ কঠিন হবে। আর এদের হাল পাত্তাও কেউ জানেনা। কলকাতার পাঁচশো বস্তিতে পাঁচশো হাজার ফটিক পাবে আর আসলে ওই তার নাম নাকি তাই বা কে জানে? দেখগে সে এখন ভূষণ সেজে, নরু সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাবনার কথা।

তবু কেশব বলে—মুরারীপুকুর বস্তিতে একজন ওর আত্মীয়ের নাম পেয়েছি স্যার। ওখানেই যাচ্ছি।

অনুপবাবু বলে

—হ্যাঁ। এবার ক্যালকাটা রোড রেস শুরু করো। ছাখো যদি কোনও পাত্তা পাও। বাই দি বাই ওই ফটিক, ন্যাপা মানিক জোড়ের ক্রিমিন্যাল রেকর্ডও খোঁজো মহাফেজখানায়, যদি ওদের কোন খবর থাকে। এত এক্সপার্ট কৃতকর্মা লোক, আগেও দু'একবার নিশ্চয়ই শ্রীঘর খেটেছে। ছাখো যদি কোন ছবি টবি পাও। কাজের সুবিধা হবে। রতন তুমি বরং রেকর্ড খোঁজো, আর কেশব যাক সেই

আত্মীয়ের বাড়িতে, কুটুমের যদি খবর পায়। প্রশান্ত তো দেখছি মৌনীবাবা হয়ে গেছে। আমি দেখি যদি ওর বোল ফোটাতে পারি।

কেশব বলে—দেখুন যদি কিছু বলে। আমিও দেখছি মুরারী-পুকুরে গিয়ে।

আর রতনকে বলে অনুপবাবু—রতন, তুমি ছাখোগে, ফটিক চন্দরের সত্যি কোন অতীত রেকর্ড পাও কিনা। ছবিও।

ছাতা হাতে এখন কেশব পাল চলেছে সাধারণ লোকের মতই।

কেশব পাল এখন একটু ছিরি বদলে এসেছে মুরারীপুকুর বস্তিতে। এই বস্তিটাও বিরাট।

বাইরে ফুটপাতে দোকান পশার রয়েছে, কেনা বেচাও চলছে। পিছনে শুরু হয়েছে বস্তিটা।

ইদানীং আর পুরো বস্তি এটা নয়। বস্তির মধ্যে ছ'একটা সরু রাস্তা গেছে, যদিও সেগুলো আবর্জনা ফেলার জায়গা। পচা আবর্জনা, মরা বিড়াল, কচিকাঁচা ছেলের পাল সবই আছে। মাঝে মাঝে ছ'একটা কোঠা-দালানও রয়েছে। এমাথা থেকে ওমাথা অবধি ছড়ানো বস্তিটা।

এখানে নানা পেশার লোকই থাকে।

মায় পকেটমার, সিঁদেল চোর সবাই। এহেন বিচিত্ররাজ্যে এসে জলকলের মিস্ত্রী ভূতনাথকে ঠিক খুঁজেও পায়না কেশব। একটা পথের ধারে চায়ের দোকানে বসে ভাবছে কেশব।

একজন জাঁদরেল গোছের লোক, গলায় লাল রুমাল বাঁধা। কেশবকে শুধোয়—কাকে ঢুড়সেন মোশায়? অনেক টাইম দেখছি চক্কর কাটছেন? কি মতলোব? ছনম্বরীর তাল নাকি হে?

কেশব ওই সব মালদের তার এলাকা হলে এতক্ষণে ওকে বুঝিয়ে দিত, কিন্তু এখন ওসব করতে চায় না সে। কেশব বলে

—ভূতনাথ, জলকলের মিস্ত্রী এখানে থাকে, তাকেই খুঁজছি।

—ভূতনাথ! ক্যা মালুম।

কেশব চলে এলো, লোকটা তাকে দেখছে তখনও। বৈকাল গড়িয়ে আসছে।

একটা পানের দোকানে এসে সিগ্রেট কিনছে কেশব। কোন কাজই হয়নি। ভূতনাথ নো পাত্তা হয়েই আছে।

হঠাৎ একটি শীর্ণকায় লোককে দেখে চাইল। মাঝবয়সী গৃহস্থ পোষা লোক। বলে চলেছে সে সঙ্গীকে

—জানতাম ও শালা ডোবাবে! গুচ্ছের টাকা দিলাম—কত করে বল্লাম দোতালায় যাতে জল পাই একটু ত্মাখ। তা শালা খচ্চর ভুতনাথের কাণ্ড দেখলে? বলে কিনা ও পাম্পে হবেনা। পাম্প বদলান—দু'হাজার ট্যাকার ধাক্কায় ফেলে দিলে হে। মিস্ত্রী।

কেশব এগিয়ে যায় ভূতনাথ মিস্ত্রীর নাম শুনে।

ভদ্রলোককে শুধোয়—ভূতনাথ মিস্ত্রীর বাড়িটা কোথায় জানেন দাদা?

ভদ্রলোক ওকে দেখে বলে,

—শালা আপনাকেও ডুবিয়েছে বুঝি? দেখুন গে—ওই খাল-টালি ছাওয়া বাড়িটা দেখছেন বাঁ হাতে ঘুরে, ওইটাই ওর ঠিকানা। দেখুন গে—

এগিয়ে চলে কেশব ওই বাড়িটার দিকে। ভূতনাথকে নয় ফটিককে তার দরকার।

ভূতনাথ ওর কথা শুনে বলে—

—ফটিককে খুঁজছেন? সেই হারামজাদা, নচ্ছারকে? আপনিও কি তুনম্বরী কারবার করেন মশাই? যানতো—এখানে ওনামে কেউ থাকে না।

কেশব ফটিকের গুণের পরিচয় ক্রমশঃ পাচ্ছে। তবু বলে সে,

—চটছেন কেন? ওর খবর দরকার একটু।

ভূতনাথ বলে—এখানে ছিল আগে, তারপর ওর ব্যাপার স্যাপার দেখে ওকে তাড়িয়ে দিইছি। ওর খবর জানিনা। তালাচাবি মেরামতের কাজ জানে—কোথাও তালাপট্টিতে খোঁজ খবর নিতে পারেন। ওরা যদি জানে। বেশ কিছুদিন ম্যাজিকের দলে কাজ করলো ম্যাজিকও দেখাতো নাকি। তাই করগে—তানয় যতসব বাঁদরামি।

ভূতনাথ জবাব দিয়েই একটা বস্তাতে ওর কলসারাই-এর যন্ত্রপাতি থাকে, সেটা ঘাড়ে নিয়ে হনহন করে বের হয়ে গেল।

কেশব পাল তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। অনেক আশা নিয়েই এসেছিল সে। ভেবেছিল ফটিককে এখানে নির্ঘাৎ পেয়ে যাবে। ব্যস তার কাজ হয়ে যেতো।

কিন্তু বরাত মন্দ. এত কষ্টকরে ঘুরে যদি তার খবর পাওয়া গেল, দর্শন পেলনা মহাপুরুষের।

ফটিক চন্দর আবার বেপাত্তা হয়ে গেল। এতবড় কলকাতায় কেয়ার অব ফুটপাথ পার্টির লোককে খুঁজে বের করা বোধহয় অসাধ্য। কলকাতার জনারণ্য অরণ্যের মতই রহস্যময়, গভীর।

কেশব পাল ফিরছে, রোদের মধ্যে ছাতা মেলে চলেছে। ও জানেনা চায়ের দোকানের সেই যণ্ডামার্কা লোকটা ওদিকের একটা গাছের নীচে থেকে ওর দিকেই নজর রেখেছে। সে দেখেছে ভূতনাথকে একটু আগেই যন্ত্রপাতি নিয়ে বের হয়ে যেতে, তারপর সেই ছাতাওয়ালা লোকটাকে ফিরে যেতে দেখে সন্দেহই হয়।

ভূতনাথের কাছে এসেছিল সে কল সারাবার জন্য নয়, বোধহয় অন্য কোন দরকারেই।

লোকটা গজরাচ্ছে। কেশব ছাতার আড়ালে সেটা দেখতে পায়না, আপন মনে চলেছে সে।

রতন সেন রেকর্ড ঘাঁটছে রাশিকৃত ফর্ম—ফটো, সারা কলকাতা মহানগরীতে এত মহাপুরুষদের ভিড় দেখলে অবাক হতে হয়।

নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে সাজানো বেশ কয়েকটা বই হাতড়ে হঠাৎ ফটিকের নাম, ফটোও বের হয়। ফটিকচাঁদ কর্মকার।

এই সেই ফটিক কিনা কে জানে। তবু রতন তারই খবর নেয়। এর আগে কাশীপুরে ধরা পড়েছে দু'বার। জেলও খেটেছে। তবে ন্যাপার কোন নাম ছবি পায়না। ওটা তেমন বনেদী চোর নয় বোধহয়। মামুলি ছিঁচকে। তাই সে গলে গেছে পুলিশের জাল থেকে।

ফটিকের একটা ছবিও এনেছে রতন, খবরও ঃ

কেশব মুরারীপুকুর বস্তি থেকে চক্কর মেরে ফিরেছে থানায়।

অনুপবাবু বলে—কিছু পাত্তা পেলে ?

কেশব জানায়—ওর দাদা ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন কোথায় থাকে ফটিক তাও সে জানেনা। ভাই'এর নাকি অনেক গুণ।

এমন সময় রতনকে ঢুকতে দেখে চাইল ওরা।

রতন বলে—এক ব্যাটা ফটিক কর্মকারের পাত্তা পেয়েছি রেকর্ডে। দুবার জেলও খেটেছে। ব্যাটা তালাচাবির কাজে ওস্তাদ। ছবিও এনেছি।

ছবিটা দেখেই কেশব চমকে ওঠে।

—এই ব্যাটাকে তো দেখেছিলাম চায়ের দোকানে। ওর দাদার কেন খোঁজ করছি এসবও জানতে চাইল। বললো চিনিনা ভূতনাথকে।

রতন বলে-তাই নাকি !

কেশব বলে হ্যা। ইস্ ব্যাটাকে চিনতে পারলাম না।

ওব্যাটা এবার নির্ঘাৎ সটকে যাবে ওখান থেকে।

সেই মুখ, কপালে কাটা দাগ, তীক্ষ্ণ চাহনি। বলিষ্ঠ ঘাড়টা, বেশ গাঁট্টা গোট্টাই। দেখতে এড়ে গরুর মতই। তাকে হাতে পেয়েও

ধরতে পারেনি, কারণ এর আগে তাকে দেখেনি কেশব, চেনেনা ; তাই হাত ফস্‌কে বেরিয়ে গেছে।

অনুপবাবু বলে—তাহলে সেই ব্যাটাই। প্রশান্তকে আনো ওকেও দেখাও ছবিটা।

রতন বলে—যদি ঠিক না বলে ?

কেশব গর্জে ওঠে—তাহলে এক রদ্দায় ওরই ঘাড় ভাঙবো।

অনুপবাবু জানায়—সেটা খুব সুখের হবেনা কেশব। একটু চুপচাপ থাকো। ঘাড় ভাঙ্গার লোকটাকেই এবার দেখতে হবে।

প্রশান্ত এখন মিইয়ে গেছে।

বেশ বুঝেছে জালটা এবার গুটিয়ে আনছে পুলিশ, এরা মাটির তল থেকে যেন অকাটাসাক্ষী প্রমাণ সব তুলে আনছে। ওকে ছবিটা দেখিয়ে শুধোয় অনুপবাবু।

—একে চেন ?

প্রশান্ত চমকে ওঠে। এ সেই লোকটাই। প্রশান্ত বলে মিনমিন করে।

—ঠিক চিনতে পারছিনা,

—মিথ্যে কথা! কেশব গর্জে ওঠে। প্রশান্ত ওর কঠিন দেহটাকে ভয় করে। বলে প্রশান্ত—

—মনে হয় এই ফটিক।

অনুপবাবু শুধোয়—তোমার চ্যালা, আর এটাও। মৃত স্যাপার ছবিটাও দেখায়। প্রশান্ত দেখছে সেটাও। বলে হ্যা। এই দু'জনই ওই চুরির কাজ করতো।

—গুড বয়। অনুপবাবু যেন খুশী হয়েছে।

কেশব ভাবছে এবার ফটিকের কথা।

অনুপবাবু বলে—এখন দুটো কেসই একসূত্রে বাধা। একটার সঙ্গে একটা। তাই ফটিককে চাই কেশব, যেভাবে হোক ওকে খুঁজে বের করতেই হবে। তাহলেই তদন্ত শেষ। তুমি আর রতন এবার কলকাতা রোড রেসে নেমে পড়ো।

কেশব একবার হাতে পেয়ে তাকে হারিয়েছে। তাই রাগটা তার আছে। বলে সে—ব্যাটাকে ধরতেই হবে স্যার। একবার ফসকেছে আর পারবে না।

ফটিকচাঁদ কর্মকার বেশ কিছুদিন আগে তস্য অগ্রজ ভূতনাথ কর্মকারের আশ্রয়ে থেকে টুকটাক কাজ করতো কোন কারখানায়। দশাসই চেহারা, রংটাও কালো আর দেহের পেশীগুলোও তার লোহার কাজ করে লোহার মতই শক্ত হয়ে উঠেছিল।

কারিগর হিসাবে ভালোই। সেই কারখানায় লোহার নানা জিনিষপত্র, তালাচাবি তৈরী হতো। ফটিক তালাচাবির কাযই করতো।

শক্ত হাত—কিন্তু আঙুলে যেন যাদুছিল। যে কোন রকমের তালাই তার হাতের ছোঁয়ায় খুলে যেতো। নাহলে নকল চাবি তৈরী করতেও তার সময় লাগতো না।

বেশ চলছিল, কিন্তু লাভের অঙ্ক কম হওয়ায় হুঁসিয়ার মালিক একদিন সেই কারখানা বন্ধই করে দিল, ফটিকও বেকার হয়ে গেল।

বস্তিতে দাদার ওখানে থাকে। তার দেহের অনুপাতে খাবারও চাই, ভূতনাথের স্ত্রী খেতে দেবার সময় গজগজ করে

—বসে বসে হাতির খোরাক যোগাতে পারবো না। খেটে খাওগে বাপু।

ফটিকও ক্রমশই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

এদিকে কাজেরও সন্ধান নেই। ওখানে এখানে ঘোরে-সন্ধার পর আবার চুল্লু, মদ যাহোক কিছু চাই। এদিকে পয়সাও নেই। নীরব রাগে, বঞ্চনায় ফটিক মাঝে মাঝে যেন ক্ষেপে ওঠে।

ফটিককে সেদিন গোলাপ সিং বলে

—কায কাম করবি? কি রোজকার হয়, তালাচাবি সারিয়ে?

গোলাপ সিং এর চোলাই এর গোপন ব্যবসা। ট্রাক বোঝাই মদ রাতের অন্ধকারে এখান ওখানে চালান যায়। ফটিক বেশ কিছুদিন এই কায করার পর পুলিশের নজরে পড়তে কেটে পড়ে।

আবার বেকার।

আর ভূতনাথও দেখেছে ভাই এর স্বভাব চরিত্রও বদলে গেছে। মদ গিলে বাড়ি ফেরে, খিস্তী করে যখন তখন,

ফটিকও বুঝেছে এখানে থাকা যাবে না, এদিকে ভাবতে হবে। দেহে তার অসুরের মত শক্তি হাতের কাজও জানে.

ফটিকের দু'একজন চ্যালাও জুটে যায়।

ফটিক তখন রাতের অন্ধকারে বাড়িতে, দোকানে হানা দিতে থাকে। কাশীপুর অঞ্চলের বেশ কিছু গুদাম থেকে দামী মালপত্রও পাচার করে।

হঠাৎ সেই অবস্থাতেই একদিন ধরাও পড়লো ফটিক, আর কয়েক বছর জেলে কাটিয়ে আরও পাকা, বনেদী চোর হয়ে বেরুলো। দু'চার দিনের মধ্যেই সাগরেদও জুটে যায়, ফটিক এখন পাকা চোর।

ভূতনাথের এখানে আসে; টাকাপয়সা দেয়।

ভূতনাথ ভায়ের জন্য কাশীপুরের বস্তি ছেড়ে এখন মুরারীপুকুরেই এসেছে।

ও নিরীহ ধরণের মানুষ।

ভাই এর কীর্তিকলাপ সে জানে, তাই ফটিক এখানে আসুক সে চায় না। কিন্তু ভয়ে কিছু বলতে পারে না। কারণ ফটিক এর মধ্যে দু'একটা খুনও করেছে। ওর চোখমুখে সেই বীভৎসতা ফুটে ওঠে। দু'একদিন থাকে—আবার উধাও হয় ফটিক।

আবার কোথাও চুরি ডাকাতি করে।

ফটিক ইদানীং একটু ভদ্রস্থ হতে চায়। পয়সাও হাতে আসে, তাই দামী হোটেলেও মদ খেতে যায় সেখানে খবরাখবরও মেলে।

সেই সুবাদেই ফটিকচাঁদ পরিচিত হয় প্রশান্তের সঙ্গে, ক্রমশই প্রশান্ত তার গুণের খবর পেয়েছে। তার বোঝে ওই অসীম শক্তিশালী, সাহসী ফটিককে তার দরকার।

ছ'জনে মদের টেবিলে বসেই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

প্রশান্ত তখন শহর কলকাতার অভিজাত মহলে পরিচিত হয়ে উঠেছে। অনেক ধনী গিন্নীদের ইরার ফ্ল্যাটে জুয়োর টেবিলে দেখা যায়। প্রশান্ত সেই উপর তলার সমাজে তখন ঠাই পেয়েছে, তার সুপুরুষ চেহারার জন্য মেয়েরা ওকে একটু কাছে পেতে চায়। তাই বলনাচ, টুইষ্ট নাচের আসরও প্রশান্ত নাহলে জমেনা।

তাই এদের পার্টির খবর প্রশান্ত জানে, সেই পার্টিতে আগতদের খালি ফ্ল্যাটে প্রায়ই চুরি হয়, দামী সোনার গহনা, জড়োয়া সেট—নেকলেস—গহনাপত্র উধাও হয়।

ফটিককেই সঠিক খবর দেয় প্রশান্ত। আর কায সারে ফটিক চাঁদ তার ছ'একজন সাগরেদ নিয়ে, মালপত্র চলে যায় ইরার ফ্ল্যাটে, প্রশান্তের সেই ফ্ল্যাটটাই প্রধান আস্তানা।

ইরাও ক্রমশঃ টের পায় রোজকারের বহরটা। তাকেও নেশায় পেয়ে গেছে, টাকা সোনা মণিমুক্তা অনেক আসে। বর্দ্ধমানের হতদরিদ্র মেয়েটি এবার অনেক পাবার স্বপ্ন দেখে।

কিন্তু বাদ সাধলো স্বয়ং ফটিক চন্দ্র, সে জানে কি পরিমান সোনা দানা, টাকা সে তুলে দেয় প্রশান্ত আর ইরার হাতে। আসল কার্য সেইই করে।

ফটিক ছ'একজন সাগরেদকে নিয়ে কাজ করে। ন্যাপা তাদের নেতা ফটিককে সমীহ করে। ওস্তাদ বলে মানে। সেও বলে-কি মালকড়ি, পাই ওস্তাদ। তুমিই বা কি পাও রাত ভোর খেটে, জানের পরোয়া না করে?

ফটিকও এবার গোঁ ধরে। প্রশান্ত ইরাকে জানায়।

—ভাগ দিতে হবে সাহেব।

ইরাই এখন হিসেবী হয়ে ওঠে। বলে—মজুরিতে নগদ দিই ফটিক।

ফটিক বলে—মজুরীও দিতে হবে, বখরাও চাই। চমকে ওঠে প্রশান্ত। সে চতুর লোক। বলে

—ঠিক আছে, দেবো কিছু?

ফটিক জানায়—কিছু না। চার আনা বখরা!

ইরা ফুসেঁ ওঠে—আমরাই সব করি, তুই শুধু মাল হড়কে আনিস। এর বেশী কিছুই দেবনা। গড়বড় করলে পুলিশে খবর দিয়ে তোকে আবার জেলে পুরে দেব।

ফটিকের মাথায় রক্ত চড়ে।

চোখ দুটো লাল হয়ে যায়। তার অজানতেই শক্ত হাতের মুঠি কঠিন হয়ে আসে। ওই অবস্থাতেই সে খুন করেছে দু'একটি।

কিন্তু সামলে নেয় তখন কার মত।

ইরা বলে-তোদের লাগবেনা। অন্য লোক দিয়ে কায করাবো। আর তুই কেমন কায করে বাইরে থাকিস দেখছি এবার।

ফটিক গুম হয়ে বের হয়ে আসে।

প্রশান্ত বলে ইরাকে—ওকে এসব বলতে গেলে কেন? পুলিশের কথাই বা কেন বলতে গেলে?

ইরা বলে—ওদের দিয়ে কায করাতে গেলে এমনি চাপেই রাখতে হবে। নাহলে মাথায় চড়বে।

রাত নামে।

ফটিক বের হয়ে এসেছে। সে আর ন্যাপা বসে আছে লেকের ধারে গাছের নীচে। দু-তিন বোতল মদও গিলেছে দুজনে।

ন্যাপা বলে—পুলিশে খবর দিলে যে বিপদে পড়বো গো! আর কাযপত্র করাবেনা বলছো! বেশ আসছিল দু-চার ট্যাকা। ছুঁড়ির জন্য সব যাবে।

ফটিকের মাথায় রক্ত উঠে পড়েছে।

দেখছে ওই ফ্ল্যাটের আলো নিভে গেছে। প্রশান্তও চলে গেছে। চলে গেছে রাতের ফূর্ত্তি করতে আসা মেয়ে পুরুষের দল। গাড়িগুলো আর নীচে নেই।

ফটিক ওঠে। ন্যাপা শুধোয়

—কোথায় চল্লে!

ফটিক বলে—চেল্লাবিনা। আমার সঙ্গে আয়। জবাবটা দিতে হবে আজই। পুলিশে দেবে! খানকি মাগীকে দেখাচ্ছি মজা!

সেই রাতের অন্ধকারে ইরাকেই হিংস্র ফটিক খুন করেছিল। ন্যাপা ছিঁচকে চোর, সে এতবড় ফ্ল্যাটে একটি মেয়েকে খুন করে হঠাৎ কেমন বিভ্রান্ত হয়ে যায়।

জীবনে এসব করার কথা কোন দিনই ভাবেনি। এ মহাপাপ।

এর ফলও খুবই সাংঘাতিক।

ওই ফটিক খুনে শয়তান, তাকে দিয়ে এতবড় পাপ কায করিয়েছে। ন্যাপা তাই লেকের ধারে এসে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল।

ন্যাপা মদের নেশায় গর্জায়

—ফটকে তুই চোরই নোস খুনে। শয়তান। আমাকেও ফাঁসালি আজ। আমি পুলিশে যাবো—সব কথা বলবো।

ফটিকের মাথায় রক্ত উঠে যায় আবার পুলিশের নাম শুনে। ন্যাপাকে দেখছে সে। ওই ছিঁচকে চোরদের সে বিশ্বাস করে না। পুলিশেই যাবে ন্যাপা।

ফটিক ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে পারে খুনের কথা। তাই সেও সিদ্ধান্ত নেয় ন্যাপাকেও সরিয়ে দিতে। সহজ ভাবে বলে—ছাড় ওসব। মদ খা। তারপর কাল সকালেই গে পুলিশকে সব বলবি। ধর—

ন্যাপা বোতল পেয়ে খুশী হয়। বলে

—তাই যাবো।

মদ গিলছে ন্যাপা, এই ফাঁকে ফটিক সর্বশক্তি দিয়ে পিছন থেকে ওর মাথায় রড মেরে মাথা ভেঙ্গে দিয়ে লেকের জলে ফেলে রক্ত ধুয়ে—প্রমাণ সব লোপ করে সরে গেল।

ক্রমশঃ ফটিক মনে করতে পারে একই রাতের আঁধারে দুটো খুন করেছে সে। তাই চুপ চাপ থাকে ক'দিন। আর খবরও রাখছে—প্রশান্তের উপরও তার নজর আছে, রাগও।

সেদিন প্রশান্ত পালাচ্ছে দেশ ছেড়ে, খবরটা পেয়েই ফটকে এসেছিল ওর সঙ্গে-শেষ বোঝাপড়া করতে। যাতে প্রশান্ত পুলিশকে কিছু খবর না দিতে পারে। আর ফটিকের টাকাব দরকার। প্রশান্তের সব টাকা সে লুটে নিয়ে যাবে।

কিন্তু সেই কাযটা শেষ করতে পারেনি।

ঠিক সেই সময়ই প্রশান্তের ফ্ল্যাটে এসে পড়ে পুলিশ নিয়ে অনুপ ঘোষ, ফটিক জানতে পেরে কায ফেলে রেখেই পালিয়ে যায়।

প্রশান্ত বেঁচে গেল সে যাত্রা।

কিন্তু বিপদ হয়েছে ফটিক চন্দরের।

বেশ বুঝেছে ফটিক। প্রশান্তই এবার পুলিশকে তার ঘরের খবর দিয়েছে, তাই সাবধান হয়েছে সে।

প্রশান্ত এখন পুলিশের হাজতে। তাই ভয় পেয়েছে ফটিক। সাবধানও হতে হয়েছে। বেশ জানে সে প্রশান্ত নিশ্চয়ই পুলিশকে সবই বলে দেবে আর পুলিশও তার পিছনে লাগবে।

তাই ফটিক ও নজর রেখেছিল, দাদা ভূতনাথ তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, ফটিকের ঠাঁই এখন অন্যত্র। তবু এই মুরারীপুকুর

আস্তানার উপরও নজর রেখেছিল। ওই চায়ের দোকানে সেদিন বলিষ্ঠ একটা লোককে তার দাদার খবর নিতে দেখে অবাক হয়।

ফটিক ক'বছরেই পুলিশদের গন্ধ পায়। খোচররা যখন যে বেশেই থাকুক না কেন শিকারী কুকুরের মত ফটিক খোচরদের গায়ের গন্ধ পেয়ে যায়। তাই ওই লোকটাকে দেখে তার সন্দেহই হয়েছিল।

আরও সন্দেহ হয়েছিল লোকটা কল সারাবো বলেছিল, কিন্তু মিস্ত্রীকে সঙ্গে না নিয়েই ফিরছিল, মিস্ত্রী চলে গেল অন্য কাজে। জরুরী কাজ বলেছিল কলের। কিন্তু মিস্ত্রীকে নিল না। অর্থাৎ মিস্ত্রী খোঁজাটা অজুহাত মাত্র, এসেছিল ওই আস্তানায় ওই পুলিশের টিকটিকি ফটিকেরই খোঁজে।

ফটিক লোকটাকে দূর থেকেই ভালো করে দেখেছিল। আর বুঝেছিল তার পিছনে এবার ওরা পড়েছে। প্রশান্ত তাহলে পুলিশকে সব খবরই দিয়েছে।

ফটিক এখন ভয়ও পেয়েছে।

তাই ওই দিককার বস্তি ছেড়ে চলে এসেছে কর্মব্যস্ত বড়বাজারের লোহাপট্টি, পান পোস্তার এদিকে। দু'একজন চেনাজানা দোস্ত আছে তাদেরই আশ্রয়ে। হাজার মানুষের ভিড়ে যেন হারিয়ে যেতে চায় সে।

বিরাট বাড়িটার অবস্থাও জরাজীর্ণ, অসংখ্য খুপরি ঘর, মৌচাকের খুপরির মতই,—ছাদের মাথায় একটা খুপরি ঘরেই আশ্রয় নিয়েছে ফটিক।

এবার ভয়ও ধরেছে। পুলিশ তাকে খুঁজছে—ধরতে পারলে ফাঁসির দড়িতেই ঝোলাবে। মনে হয় ফটিকের এখান থেকে কোথাও দূরে পালাবে। কিন্তু কোথায় যাবে জানে না।

আজ থেকে বেশ কিছু বছর আগে দাদার হাত ধরে একটি

কিশোর ঢুকে ছিল ওই হাওড়া ব্রিজ-এর পথ ধরে এই মহানগরে জীবিকার সন্ধানে। বিস্মিত চাহনিতে দেখেছিল এই আজব শহরটাকে। এখানেই তাকে বাঁচতে হবে, অন্নসংস্থান করতে হবে।

এই মহানগর নাকি কাউকে ফিরিয়ে দেয় না।

সেই দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে আজ ফটিক এই মহানগরের কোন অন্ধকার গোপন ধাঁধায় হারিয়ে গেছে। আজ সামনে কোন পথই নেই।

ফটিক চুপচাপ থাকে।

ভোর বেলায় একবার গঙ্গার ঘাটের আখড়ায় বের হয়। শরীরটাকে সবল রাখার জন্যই ওখানে গঙ্গার ধারে ওর দোস্তদের আখড়ায় গিয়ে ডন বৈঠকি, কুস্তিও করে। তারপরই স্নান করে এসে এই ছাদের অরণ্যে লুকিয়ে থাকে। দিনকতক থাকতে হবে, তারপর অন্যত্র চলে যাবে হাওয়া ঠাণ্ডা হলেই।

কেশব হাল ছাড়েনি।

ঘুরছে সে। আর থানাতেও যায় মাঝে মাঝে খবর নিতে। কিন্তু সেই ফটিক চাঁদ যেন কর্পূরের মত উবে গেছে। ওদিকে কাগজেও বের হয়েছে খবরটা। পুলিশ এই জোড়াখুনের কোন কিনারা করতে পারছেনা, এনিয়ে দৈনিক যুগদেবতায় কড়া সমালোচনা বের হয়েছে।

অনুপবাবুও ভাবনায় পড়েছে।

—কি হে কেশব, পাত্তা পেলে ব্যাটার?

কেশব তখন লিষ্টি ধরে বিভিন্ন আখড়ায় ঘুরছে। ফটিক এককালে কুস্তি করতো। এখনও ব্যায়াম নিশ্চয়ই করে, তাই এখান ওখানে ঘুরছে।

হঠাৎ সেদিন ভোরেই কেশব গেছে ফুলপট্টিতে, তার বাড়িতে কি অনুষ্ঠান। কিছু ফুল মালার দরকার। আর ভোরে গঙ্গার ধারে ফুলের হোলসেল মার্কেট বসে, সেখানে তাজা ফুল মালা সস্তায় মেলে। তাই গেছে ফুল কিনতে।

হঠাৎ গঙ্গার ধারে ওপাশে কিছু লোককে ডন বৈঠক, কুস্তি করতে দেখে কি খেয়াল বশতঃ এগিয়ে গেল। দেখছে ওদের।

হঠাৎ ওদিকে সেই মূর্তিটা দেখে চমকে ওঠে। চেনা মুখই। সেই মুরারীপুকুর বস্তির চায়ের দোকানে দেখেছিল, আর তারপর ওর ছবিটা দেখে দেখে শ্রীমুখ অন্তরে বসে গেছে, সুতরাং চিনতে ভুল করেনা সে। ওই সেই ফটিকচাঁদ।

একা সে, এসময় ওকে ধরতে গেলে পালাবে। আর অন্যরাও বাধা দেবে। একটা কেলেঙ্কারী হবে। তাই কেশব চুপ করে ফুল দেখতে থাকে—আর নজর রাখে তার উপর। ফটিকও তাকে চিনতে পারেনি। কারণ সেদিন দেখেছিল গোঁফওয়ালা—ধুতি হাফসার্ট কেডস্ পরা এক মাঝবয়সী লোককে ছাতা হাতে, এ সে নয়। সুতরাং ফটিকও নজর দেয় না।

তার ডন বৈঠক সেরে গঙ্গাস্নান করে ফিরছে ফটিক, কেশবও ওই ভিড়ে মিশে তার পিছু নেয়। নিশ্চয়ই ওর আস্তানার দিকে চলেছে।

কেশবও নিরাপদ দূরত্বে থেকে এবার ওই বাজারের বড় বাড়িটায় ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে থাকে, সেও যেন এই পায়রার খোপের মত বাড়িটার কোন একটা খোপের বাসিন্দা। অনেক লোকই যাওয়া আসা করে, সুতরাং কেউই সন্দেহও করে না।

ফটিক গিয়ে ওর ছাদের খুপরীটায় ঢুকে দরজা বন্ধ করলো।

কেশবের ফুল কেনা মাথায় উঠেছে। ট্যাক্সি নিয়ে ছুটে এসেছে থানায়। অনুপবাবু বল্লেন- কি ব্যাপার?

কেশব বলে—হদিস পেয়েছি স্যার। এখুনিই রেড করতে হবে। ফটিকের পাত্তা মিলেছে।

অনুপবাবুও দলবল নিয়ে বের হয়ে পড়ে।

কেশবই বাড়িটা দেখেছে। সেই প্ল্যান করে। ও একা যাবে প্রথমে, তারপর পিছনে যাবে অন্যরা। যেন পালাতে না পারে এইভাবে বেড়াজাল দিয়ে ধরতে হবে।

অনুপবাবু বলে—হুঁশিয়ার। ব্যাটার কাছে চেম্বারও থাকতে পারে। গুলি চালাবে নির্ঘাৎ।

ফটিক একাই শুয়েছিল, এসময় দরজায় কার শব্দ শুনে উঠেছে, দরজা খুলতেই ঢুকে পড়ে একটা বলিষ্ঠ তরুণ। ফটিক চিনেছে তাকে। এই সেই খোচর। একেই দেখেছিল চায়ের দোকানে। আজ এই ঠিক গন্ধ শুঁকে শুঁকে এখানে এসে হাজির হয়েছে তাকে ধরতে।

কেশব কিছু বলার আগেই ফটিক বিদ্যুৎগতিতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এক প্রচণ্ড ধাক্কায় তাকে ছিটকে ফেলে বের হয়ে গেল। জানে সে ব্যাটা একা নিশ্চয়ই আসেনি, তাই ফটিক সিঁড়িতে না গিয়ে অন্য পথ ধরে পালাচ্ছে। পালাতেই হবে তাকে, যেভাবে হোক।

এ তার বাঁচার লড়াই।

ফটিক এবাড়িতে এসে পালাবার পথটা আগেই দেখে রেখেছিল, এবার সেই পথই নিয়েছে। প্রাণপনে দৌড়চ্ছে ভাঙ্গা সিঁড়ি বেয়ে আবছা অন্ধকারে।

কেশব প্রথম আক্রমণের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে দৌড়ে বাইরের ছাদে এসেছে। কিন্তু ফটিককে আর দেখা যায়না। ফটিক তখন চারতলার পাইপ বেয়ে দোতলার বারান্দায় এসে নেমে দৌড়াতে থাকে। ওদিকের সিঁড়ি লক্ষ্য করে।

চারিদিকে লোকজন। এরমধ্যে উপর থেকে পাইপ লক্ষ্য করে কেশবও গুলি ছুঁড়েছিল, কিন্তু ফটিকের লাগেনি। তার আগেই সে নেমে পড়েছে।

সোরগোল ওঠে—চোর, চোর।

সারা বাড়িটা যেন নিমেষের মধ্যে সজাগ হয়ে ওঠে। কোন

কোন দোকানদার দোকান বন্ধ করে। ওদিকে পুলিশবাহিনীও সিঁড়ি দিয়ে নামছে। এ বাড়ি যেন গোলক ধাঁধা। সিঁড়িটা ভাঙ্গা, সরু। জোরে নামাও যায়না।

কেশবও দৌড়চ্ছে। কিন্তু সারা বাড়িতে তখন ওই চোর চোর রবই উঠছে। চোর যে কোথায়, কেইবা চোর তা কেউ জানেনা। সেই চীৎকার কলরব বাড়ি ছাড়িয়ে রাস্তাতেও এসে পৌছেচে।

ফটিক ও দৌড়ে বের হয়ে আসে। সেও চীৎকার করছে—চোর, চোর, পাকড়ো—

লোকেও ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে— চোর, পাকড়ো।

কেশব, রতনও দৌড়চ্ছে। ফটিক এক নজর দেখে চমকে ওঠে। গাড়ি—ট্রামও থেমে গেছে ওই সোরগোলে। কোনও গাড়িতে উঠে পালাবে ফটিক তারও উপায় নেই। ওদিকে পুলিশের ভ্যানটাও এগিয়ে অসে, জাল গুটিয়ে আনছে পুলিশ।

আজ পুলিশ বাহিনীও ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে জায়গাটা, যাতে আসামী পালাতে না পারে।

গুলি চালাতো কেশব আবার। কিন্তু লোকজনের ভিড় রয়েছে। পারে না। ধরতেই হবে তাকে। ফটিকও বিপদের গুরুত্ব বুঝেছে।

হাওড়ার ব্রিজের উপর দিয়ে দৌড়চ্ছে সে, পেছনে ধেয়ে আসছে সেই পুলিশের লোকটা, এদিকে পুলিশের ভ্যানটা সামনে এসে সশব্দে ব্রেক কষতেই ছ'তিন জন লাফ দিয়ে পড়েছে, এগিয়ে আসছে, তার দিকে। মরতে হবে ফটিককে ফাঁসির দড়িতে—বহু নীচে গঙ্গার বিস্তার।

ফটিক অন্য কোন পথ না পেয়ে রেলিং টপকে সোজা গঙ্গাতেই লাফ দেয়।

ওর দেহটা শূন্যে পাক খেয়ে বহু নীচে গঙ্গার জলে গিয়ে পড়লো উজ্জ্বল সূর্যালোকে একটা কালো বিন্দুর মতো, কেশব—অনুপবাবু থমকে দাঁড়ালো।

ধরা দেয়নি ফটিকচাঁদ তাদের কাছে, বহু নীচে কোথায় হারিয়ে গেছে।

পুলিশ-লঞ্চ জল তোলপাড় করে পরদিন তুলেছে ফটিকের দেহটা। ন্যাপার লাশের মতই তার দেহটাও ফুলে একটা লাশে পরিণত হয়েছে।

তার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত সে করে গেছে নিজেই।

খুশী হয় হাজতে বসে খবরটা পেয়ে প্রশান্ত। ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হবে না তাকে। খুনের সাক্ষী, প্রমাণ লোপ পেয়ে গেছে। চুরির দায়ে কয়েক বছর অবশ্য শ্রীঘরে পচতে হবে তাকে, প্রাণে তবু বেঁচে রইল।

বর্দ্ধমান থেকে বৃদ্ধ নরেশবাবু আর তার স্ত্রীও এসেছে। তাদের মেয়েকে সনাক্ত করতে। মর্গে তাদের সুন্দরী মেয়ের সেই বিকৃত গলা মৃতদেহটা দেখে শিউরে ওঠে তারা। এ তাদের সেই শান্ত সুন্দরী রূপবতী মেয়ে নয়। যে এই মহানগরে বাঁচার পথসন্ধান করতে এসেছিল সেই ইরা এ নয়, মহানগরীর দুঃসহ লোভ, পাপের আগুনে পুড়ে ইরা বিকৃত একটি পরিচয়ে পরিণত হয়েছে। সেই নম্র শান্ত ইরা আগেই মারা গেছে এই মহানগরীতে।

নরেশবাবু, তার স্ত্রী তাদের মেয়েকেও আজ যেন চিনতে পারে না। ইরা একেবারে বদলে গেছে, হারিয়ে গেছে।

ওরা ফিরছে কলকাতা থেকে বর্দ্ধমানে।

মায়ের চোখে জল নামে। দেখছে ওরা কলকাতার কর্মব্যস্ত জীবনকে, দাঁড়াবার সময় এর নেই। ধাবমান বাস-ট্রামে চলেছে হাজারো মানুষ হাজারো কাজের ব্যস্ততায়। পথচারীদের মধ্যেও রয়েছে কত পুরুষ, নারী, বৃদ্ধ।

ওদেরই ভিড়ে সামিল হয় প্রত্যহ কতজন, ইরা সেই জীবনের

ছন্দে এক একটা ব্যতিক্রম, তাদের দুঃখ বেদনার অশ্রুতে গঙ্গার জল পরিপূর্ণ—তবু কলকাতার জীবন ছন্দ অব্যাহত গতিতে চলে, তাদের কথাও ভুলে যায় মানুষ।

নরেশবাবুর দু'চোখ জলে ভরে যায়। স্ত্রীকে নিয়ে সব হারিয়ে তারা ফিরে চলেছে তাদের দূরের শহরের নির্জনে। মহানগর তাদেরও খোঁজ রাখে না। তার জীবনে আসা যাওয়া, হারানো পাওয়ারও কোন খতিয়ান নেই।

সে নির্বিকার নিরাসক্ত। শহর কলকাতার জীবন ধারা বয়ে চলে তার আপন গতিবেগে।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—